ইউনিট
১৯

মানব জীবন বৈচিত্র - ২

ভূমিকা

জীবদেহ কেবল গঠিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, দেহের কাজগুলোর মধ্যে সমন্বয়ও প্রয়োজন। সমন্বয় বলতে বুঝায় দেহের সকল অঙ্গ ও তন্ত্র একত্রে মিলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করা। যেমন- অঙ্গসঞ্চালনের জন্য পেশীতন্ত্র, শ্বাস-প্রশ্বাস চালনার জন্য শ্বসনতন্ত্র, রেচনকার্য পরিচালনার জন্য রেচনতন্ত্র এবং সৃজনের জন্য প্রজননতন্ত্র। অঙ্গসমূহের এ পারস্পরিক সহযোগিতার কাজ করে থাকে স্নায়ুতন্ত্র ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। এমনিভাবে তন্ত্রগুলো মানবদেহের কাজগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানবদেহের অঙ্গগুলো অন্য প্রাণির তুলনায় অনেক বেশি উন্নতভাবে সংগঠিত ও সমন্বিত। এ কারণে মানবদেহ সুসংহতভাবে নিজ কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম এবং রূপ-গুণে মানুষ সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে সর্বক্ষণ 'স্বাভাবিক অবস্থা' বজায় রাখার জন্য একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা রয়েছে। দীর্ঘক্ষণ কঠিন পরিশ্রমের পর আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়, তখন দেহে সঞ্চিত খাদ্যের দহনহারও বেড়ে যায়। দেহে বেশি কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হতে থাকে। ফলে শরীরে রক্তচাপ বেড়ে যায়। হৃদপিন্ডের স্পন্দন বেড়ে যায়, পেশী ও স্নায়ু বেশি কাজের চাপে শ্লথ হয়ে পড়ে এবং দেহে ক্লান্তি আসে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এ ইউনিটে শ্বসনতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, অন্তক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১৯.১

শ্বসন ও শ্বসনতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্বসন কাকে বলে বলতে পারবেন;
- শ্বসনতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শ্বসনের রোগসমূহ ও তার প্রতিকার নিরূপণ করতে পারবেন।

শ্বসন

বিভিন্ন বিপাকীয় কার্য সম্পাদনের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে জীবের শক্তি প্রয়োজন। খাদ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে। তবে খাদ্যে শক্তি থাকে স্থিতিশক্তি হিসেবে। কোষের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের সহায়তায় খাদ্য জারিত হয়ে স্থিতিশক্তি তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হয়। আর এ তাপশক্তিকেই জীব ব্যবহার করে। শ্বসনের মাধ্যমে খাদ্য থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়। যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষের ভিতরে সরল খাদ্য উপাদান জারিত হয়ে স্থিতিশক্তি তাপশক্তি রূপে যুক্ত হয় এবং উপজাত হিসেবে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়, তাকে শ্বসন বলে।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{অক্সিজেন}}{6O_2} \xrightarrow{\text{GbRvBg}} \underset{\text{কার্বন-ডাই অক্সাইড}}{6CO_2} + \underset{\text{পানি}}{6H_2O} + \text{শক্তি}$$

শ্বসনতন্ত্র

দেহের যে অঙ্গগুলো শ্বসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, তাদের সমষ্টিকে শ্বসনতন্ত্র বলে। নিচের অঙ্গগুলো নিয়ে মানুষের শ্বসনতন্ত্র গঠিত। যথা-নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ, নাসাগলনালী, স্বররন্ধ্র, শ্বাসনালী, বায়ুনালী, ফুসফুস ও মধ্যচ্ছদা

নাসারন্ধ্র ও নাসাপথ : ইহা মুখগহ্বরের উপরে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার গহ্বর। ইহা সম্মুখে নাসিকা ছিদ্রপত্র হতে পশ্চাতে গলনালী পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি পাতলা প্রাচীর দ্বারা ইহা দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি নাসারন্ধ দৈর্ঘ্যে প্রায় আড়াই সে.মি. ও প্রস্থে এক সে.মি.। ইহার সম্মুখভাগ লোম দ্বারা আবৃত ও পশ্চাদদিকের অংশ শ্লেষ্মা ঝিল্লী দ্বারা আবৃত। আমাদের প্রশ্বাসে বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণা, রোগজীবাণু ও আবর্জনা থাকলে তা এ লোম ও ঝিল্লিতে আটকে যায়। ফলে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশের পূর্বে অনেকটা নির্মল হয়ে যায়। এর প্রাচীরগাত্রে বহু শিরা, ধমনী ও একজোড়াস্নায়ু আছে। এর সাহায্যে আমরা ঘ্রাণ নিয়ে থাকি। এজন্য নাসারন্ধ্রকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলে।

নাসাগলনালী : মুখ হা করলে মুখগহ্বরের সর্বপশ্চাতে যে অংশটি দেখা যায়, তাকে নাসাগলনালী বলে। নাসারন্ধ্রের পশ্চাদভাগ হতে স্বরযন্ত্রের উপরিভাগ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। গলনালীর উভয়পাশে দুটি গ্রন্থিপিন্ড আছে। এদেরকে টনসিল বলে। এর উপরিভাগে ও তালুর পশ্চাদভাগে ক্ষুদ্র জিহ্বার মত অংশ থাকে, একে আলজিহ্বা বলে। খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য গলাধঃকরণ করার সময় ইহা আপনা হতেই নাসারন্ধ্রের পশ্চাদভাগ বন্ধ করে দেয়। ফলে কোনো প্রকার খাদ্য নাসিকা পথে বাইরে আসতে পারে না।

স্বরযন্ত্র : ইহা শ্বাসনালীর প্রথমাংশ এবং গলনালীর নিচেই অবস্থিত। স্বরযন্ত্রের দু'ধারে দুটি মাংসপেশী আছে; এরা ভোকাল কর্ড নামে পরিচিত। এদের কম্পনের ফলে স্বরের উৎপত্তি হয়। স্বরযন্ত্র একটি ছিদ্র দিয়ে

মুখগহ্বরে উন্মুক্ত। এ ছিদ্রটিকে শ্বাসছিদ্র বলে।

শ্বাসনালী বা ট্রাকিয়া : ইহা খাদ্যনালীর সম্মুখে অবস্থিত প্রায় ১০ সে.মি. দীর্ঘ একটি ফাঁপা নল। এর প্রাচীর কতকগুলি তরুণাস্থি ও পেশী দ্বারা নির্মিত। এরা নলের গঠন বজায় রাখে ও শ্বাসনালীকে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখে।

বায়ুনালী : শ্বাসনালী স্বরযন্ত্রের নিম্নদেশ হতে ফুসফুসের নিকটবর্তী হয়ে ডান ও বাম দিকে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি ডান ফুসফুসে ও অপরটি বাম ফুসফুসে প্রবেশ করেছে। এদের প্রত্যেকটিকে ব্রঙ্কাস বলে। ফুসফুসে প্রবেশের পর এরা অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। শাখা-প্রশাখাগুলিকে ব্রঙ্কিউল বলে।

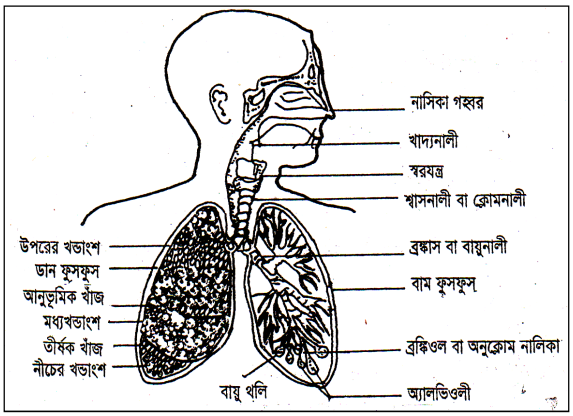

চিত্র ১৯.১-১ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র

ফুসফুস : দুটি ফুসফুস বক্ষগহ্বরের মধ্যে দুপাশে অবস্থিত। ইহা স্পঞ্জের ন্যায় নরম ও কোমল। ডান ফুসফুস তিন খন্ডে ও বাম ফুসফুস দু'খন্ডে বিভক্ত। প্রতিটি ফুসফুসে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ু প্রকোষ্ঠ বা বায়ু থলি থাকে। এ বায়ুথলিগুলোর মধ্যে গ্যাসীয় আদান প্রদান ঘটে। বায়ুথলিগুলিকে অ্যালভিওলাসও বলা হয়। প্রতিটি ব্রঙ্কিউলের শেষপ্রান্তে অ্যালভিওলাস থাকে।

মধ্যচ্ছদা : যে মাংসপেশী বক্ষগহ্বর ও উদরগহ্বরকে আলাদা করে রাখে তাকে মধ্যচ্ছদা বলে। ইহা দেখতে অনেকটা প্রসারিত ছাতার ন্যায়। মধ্যচ্ছদা সংকুচিত হলে নিচের দিকে নামে। তখন বুকের আয়তন বেড়ে যায়। আর মধ্যচ্ছদা প্রসারিত হলে উপরের দিকে উঠে যায় তখন বক্ষগহ্বর সংকুচিত হয়। মধ্যচ্ছদা প্রশ্বাস গ্রহণে অংশগ্রহণ করে।

কাজ : শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গের সম্মিলিত কার্যকারিতার ফলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণি নিশ্বাস-প্রশ্বাস চালনা করে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস চালনা ছাড়া কোনো প্রাণি বাঁচতে পারে না। ৩-৪ মিনিট নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকলে মানুষ মারা যায়।

শ্বসন প্রক্রিয়া

মানবদেহের শ্বসন প্রক্রিয়ার দুটো ধাপ বিদ্যমান; যথা-বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন।

বহিঃশ্বসন : ফুসফুসের গহ্বরে ফুসফুসীয় বায়ুথলির (অ্যালভিওলি) বায়ুর সাথে ফুসফুসীয় রক্তনালীকার অর্থাৎ কৌশিকনালীর রক্তের মধ্যে যে গ্যাসীয় আদান-প্রদান হয়, তাকে বহিঃশ্বসন বলে। বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়; যথা- ক. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ ও খ. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ।

ক. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ : প্রশ্বাসের সময় অক্সিজেনযুক্ত বায়ু বাইরে থেকে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এসময় বক্ষ পিঞ্জরের পর্শুকাগুলির পেশী সংকুচিত হওয়ায় তারা উপরের দিকে উঠে যায় এবং সামনের দিকে অগ্রসর হয়, ফলে বক্ষ গহ্বরের আয়তন বেড়ে যায়। এ সময় মধ্যচ্ছদা নিচে নেমে আসে, ফলে দৈর্ঘ্য বরাবরও বক্ষগহ্বর বিস্তৃত হয়। এভাবে বক্ষগহ্বরের আয়তন বেড়ে যাবার সাথে সাথে ফুসফুসও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ফলে অন্তঃফুসফুসীয় চাপ কমে যায়, এবং বাইরের পরিবেশ হতে অক্সিজেনযুক্ত বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং শ্বাসগ্রহণ করে। ফুসফুসের বায়ুথলিগুলি রক্তজালক দ্বারা বেষ্টিত থাকে। শিরার রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে, কিন্তু বায়ুথলির বায়ুতে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি থাকে। ফলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন বায়ুথলি থেকে কৈশিকনালীর রক্তে প্রবেশ করে।

খ. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ : শ্বসনের যে প্রক্রিয়ায় আমরা ফুসফুসের ভিতরের কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত বাতাস পরিবেশের বায়ুতে ছেড়ে দেই, তাকে নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ বলে।

প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাথে জড়িত পেশীসমূহের সংকোচন শেষ হলে পেশীসমূহ শ্লথ হয়ে যায় ও বক্ষগহ্বর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এ সময় মধ্যচ্ছদা উপরে উঠে স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে। ফলে ফুসফুসের আয়তন হ্রাস পায় এবং এর আভ্যন্তরীণ চাপ বায়ুমন্ডলের চাপ অপেক্ষা বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় ফুসফুস হতে বায়ু সহজে বাইরে নির্গত হয়। শিরার রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড(CO_2)-এর ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি থাকে বলে শিরার রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাপ বায়ুথলি অপেক্ষা বেশি থাকে। এমতাবস্থায় চাপের পার্থক্যের কারণে ব্যাপক প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড শিরার রক্ত হতে বায়ুথলিতে (অ্যালভিওলাথে) প্রবেশ করে। পরে ফুসফুসের বায়ুথলি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাইরে মুক্ত হয়।

অন্তঃশ্বসন : যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসের গহ্বরের ভিতরের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাই সমূহের বাতাস এবং এদের গাত্রস্থিত কৈশিক নালীসমূহের রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর বিনিময় ঘটে এবং খাদ্য জারণ প্রক্রিয়াকালে শক্তি উৎপন্ন হয়; তাকে অন্তঃশ্বসন বলে। অন্তঃশ্বসন প্রক্রিয়া ৩টি উপ-পর্যায়ে ঘটে থাকে; যথা- ক. অক্সিজেন পরিবহন; খ. গ্লুকোজের জারণ ও শক্তি উৎপাদন; গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহণ

ক. অক্সিজেন পরিবহন : প্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশকৃত বাতাস অ্যালভিওলাসের মিউকাসের মধ্যে দ্রবীভূত হয় (অ্যালভিওলাসের ভিতরের প্রাচীর গাত্রে অবস্থিত মিউকাস গ্রন্থি থেকে মিউকাস নিঃসৃত হয়)। এতে অ্যালভিওলাসের গহ্বরে অক্সিজেনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এ অক্সিজেন ব্যাপক প্রক্রিয়ায় কৈশিক নালীতে প্রবেশ করে। কৈশিক নালীতে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সি-হিমোগ্লোবিন অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ রক্তের মাধ্যমে হৃদপিন্ড হয়ে দেহ কোষে যায় এবং সেখানে অক্সিজেন যুক্ত হয়।

খ. গ্লুকোজের জারণ ও শক্তি উৎপাদন : শ্বসনের এ পর্যায়ে কোষের মধ্যে এনজাইমের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সহায়তায় গ্লুকোজ জারিত হয়ে তাপ শক্তি, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তাপ শক্তি এ.টি.পি (ATP = Adenosine Try Phosphate) হিসেবে কোষে সঞ্চিত থাকে। এ শক্তি দ্বারা দেহের সকল বিপাকীয় কাজ সম্পন্ন হয়।

গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন : খাদ্য জারণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড কোষ থেকে প্রথমে কৈশিক নালীর রক্তে আসে। কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রধানত বাই কার্বনেট কৌশিক নালীর রক্ত রসের মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং সেখানে বাই-কার্বনেট থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত হয়। শেষে কার্বন ডাই-অক্সাইড কৈশিক নালী ও বায়ুথলি ভেদ করে নালীপথে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগসমূহ ও প্রতিকার

শিল্প বিপ্লবের কুফল হিসেবে মাটি, আকাশ, বাতাস, পানি প্রভৃতি সবই দূষিত হয়ে পড়েছে। কলকারখানা থেকে যে সব আবর্জনা ও ধুয়া বের হচ্ছে তার দ্বারা বায়ু, মাটি দূষিত হচ্ছে। যানবাহন থেকে নির্গত ধুয়া বাতাস তথা পরিবেশ দূষিত করছে। এ সমস্ত পরিবেশ দূষনের কারণে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ছি, দেখা দিচ্ছে ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ। এ ছাড়া বিভিন্ন জীবাণু যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি দ্বারাও ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। নিচে শ্বসনতন্ত্রের সাধারণ রোগসমূহ ও তাদের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

নিউমোনিয়া : দুর্বলদেহ অতি সহজেই রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ফুসফুস আক্রান্ত হলে নিউমোনিয়া হয়ে থাকে। এ রোগে ফুসফুসে এক প্রকার তরল পদার্থ জমা হয়। কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, জ্বর ইত্যাদি নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দ্বারা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

যক্ষ্মা : এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ। *Mycobacterium tuberculosis* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে এ রোগ দেখা দেয়। এটি ছোঁয়াচে রোগ। রোগীর কফ, থুথু যেখানে সেখানে ফেললে এ রোগ বায়ুর মাধ্যমে ছড়ায়।

খুক খুক কাশি, বুক ব্যথা, জ্বর, ধীরে ধীরে ওজন কমা ও রক্ত স্বল্পতা এ রোগের লক্ষণ। এ রোগের জীবাণু ফুসফুসে প্রদাহ সৃষ্টি করে। এ রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করলে কাশির সাথে রক্ত বের হয়।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেলে এ রোগ সারানো সম্ভব। এ রোগের হাত থেকে রেহাই পেতে শিশুদের বি.সি.জি টিকা দেওয়া হয়।

ব্রঙ্কাইটিস : শ্বাস নালীর ভেতরে আবৃত ঝিল্লীর প্রদাহের কারণে এ রোগ হয়। জ্বর, খুসখুসে কাশি ও শ্বাসকষ্ট এ রোগের লক্ষণ। স্যাতস্যাঁতে পরিবেশে বসবাস, ধুলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়া ও ঠান্ডা লাগলে এ রোগ হতে পারে। এ রোগের প্রকোপে দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, এমন কি হৃদপিন্ড ও বৃক্ষ আক্রান্ত হতে পারে।

ব্রঙ্কাইটিস থেকে প্রতিকারের উপায় হিসেবে ডাক্তারের পরামর্শমত ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন।

ফুসফুসের ক্যান্সার : ফুসফুসের কতকগুলো কোষ কোনো কারণে উদ্দীপিত হয়ে অস্বাভাবিক ও অসংলগ্নভাবে বিভাজিত হয়ে শ্বাসনালীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে ফুসফুসের স্বাভাবিক ক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রধান কারণ ধুমপান করা। এ রোগ প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়লে অপারেশনের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে, না হলে মৃত্যু নিশ্চিত। এছাড়া অ্যাজমা, প্লুরিসি ইত্যাদি রোগে ফুসফুস আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, সুষম খাদ্য গ্রহণ, ধুমপান পরিহার, জ্বর বা কাশি হলে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ মত ওষুধ খেলে শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

- যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষের ভিতরে সরল খাদ্য উপাদান জারিত হয়ে স্থিতিশক্তি তাপশক্তিরূপে মুক্ত হয় এবং উপজাত হিসেবে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়, তাকে শ্বসন বলে।
- দেহের যে অঙ্গগুলো শ্বসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাদের সমষ্টিকে শ্বসনতন্ত্র বলে। অঙ্গগুলো হল- নাসারন্ধ্র বা নাসাপথ, নাসাগলনালী, স্বরতন্ত্র, শ্বাসনালী, বায়ুনালী, ফুসফুস ও মধ্যচ্ছদা।
- মানবদেহে শ্বসন প্রক্রিয়া দুটো ধাপে ঘটে; যথা-বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন।
- দূষিত পরিবেশে ও জীবাণুঘটিত কারণে শ্বসনতন্ত্রে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। যেমন- নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, ফুসফুসের ক্যান্সার, অ্যাজমা, প্লুরিসি প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ফুসফুসে বায়ু প্রবেশকে কি বলা হয়?

ক. নিঃশ্বাস খ. প্রশ্বাস গ. শ্বাসত্যাগ ঘ. কোনোটাই না

২. মুখগহ্বরের উপরে অবস্থিত ত্রিকোণাকার গহ্বরের নাম কি?

ক. নাসারন্ধ্র খ. গলনালী গ. শ্বাসনালী ঘ. বায়ুনালী

৩. খাদ্যনালীর সম্মুখে অবস্থিত নালীকে কি বলে?

ক. বায়ুনালী খ. গলনালী গ. স্বরতন্ত্র ঘ. শ্বাসনালী

৪. শ্বাসনালীর অগ্রভাগ দু'অংশে বিভক্ত, তার নাম কি?

ক. বায়ুনালী খ. গলনালী গ. ব্রঙ্কাস ঘ. ব্রঙ্কিউল

৫. বায়ুথলিকে কি বলা হয়?

ক. ব্রঙ্কাস খ. অ্যালভিকিওল গ. ব্রঙ্কিউল ঘ. ট্রাকিয়া।

পাঠ ১৯.২

রেচন ও রেচনতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রেচনের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- রেচনতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- রেচনতন্ত্রের কাজগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- রেচন অঙ্গসমূহের সাধারণ রোগ ও তাদের প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবেন।

রেচন

প্রাণিদের অভ্যন্তরে নানা ধরনের জৈবিক বা শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সংঘঠিত হয়। এসব বিপাকীয় রাসায়নিক বিক্রিয়াদিতে উপজাত হিসেবে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি নাইট্রোজেনজাত জৈব যৌগ উৎপন্ন হয়। এসব জৈব যৌগগুলো শরীরের জন্য অপ্রয়োজনীয় এবং সাধারণত ক্ষতিকারক। এজন্য এ সকল দ্রব্য দেহ থেকে নিষ্কাষণ করা একান্ত অপরিহার্য। বিপাক কার্যের ফলে সৃষ্ট এসব অপ্রয়োজনীয় ও বর্জ্য পদার্থকে সার্বিকভাবে রেচন পদার্থ বলে। যে প্রক্রিয়ায় প্রাণিকোষে বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ দেহ হতে দ্রুত ও নিয়মিত নিষ্কাশিত হয়, তাকে রেচন বলে। যে সব অঙ্গ রেচন কাজে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে রেচন অঙ্গ বলে। যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গতন্ত্র রেচনের সাথে জড়িত থাকে তাকে রেচনতন্ত্র বলে।

রেচন পদার্থ : মানুষের বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থসমূহ নিম্নরূপ-

১. নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ- অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড।

২. কার্বন ডাই-অক্সাইড

৩. পিত্ত রঞ্জক

৪. ঘাম ইত্যাদি।

রেচন অঙ্গ : নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি মানুষের দেহ থেকে রেচন পদার্থ নিষ্কাশনে অংশ গ্রহণ করে; যথা-

১. ত্বক (পানি, লবণ ও কিছু পরিমাণ ইউরিয়া)
২. ফুসফুস (কার্বন ডাই-অক্সাইড)
৩. যকৃত (পিত্ত রসের পিত্তরঞ্জক)
৪. বৃক্ক (নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য, অতিরিক্ত লবণ ও পানি)

প্রাণিদেহের সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থের শতকরা ৭৫ ভাগ অংশ রেচনকার্য সম্পন্ন করে বৃক্ক। এজন্য বৃক্ককে প্রধান রেচন

অঙ্গ বলা হয়। মানবদেহে ফুসফুসের সাহায্যে কার্বন ডাই অক্সাইড, ত্বকের সাহায্যে ঘাম জাতীয় পদার্থ, যকৃতের সাহায্যে পিত্তরঞ্জক এবং বৃক্কের সাহায্যে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ বা মূত্র (Urine) নিষ্কাশিত হয়। সকল ধরনের বর্জ্য বা রেচন পদার্থের নিষ্কাশন করার পদ্ধতিকে রেচন পদ্ধতি বলা হলেও, প্রকৃতপক্ষে রেচন বলতে আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে বহিষ্কার করার পদ্ধতিকে বুঝায়। কাজেই মূত্রই মানবদেহের একটা প্রধান রেচন দ্রব্য এবং বৃক্কই মূত্র নিষ্কাশনের প্রধান অঙ্গ।

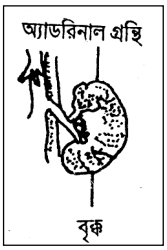

চিত্র ১৯.২.১ : (ক) বৃক্ক (অঙ্কীয় দৃশ্য)

নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থের উৎপত্তি

আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। অ্যামাইনো অ্যাসিড দ্বারা দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি ঘটে। এর পরও কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড অতিরিক্ত হিসেবে থেকে যায়। ফলে অতিরিক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড যকৃতে আসার পর বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য ইউরিয়া উৎপন্ন করে। ইউরিয়া রক্তে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

রেচনতন্ত্র (নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনতন্ত্র)

মানুষের রেচনতন্ত্র নিম্নলিখিত অঙ্গসমূহের সমন্বয়ে গঠিত; যথা-

১. একজোড়া বৃক্ক
২. একজোড়া রেচননালী (গাবনী বা ইউরেটার)
৩. একটা মূত্রথলি ও
৪. একটা মূত্রনালী

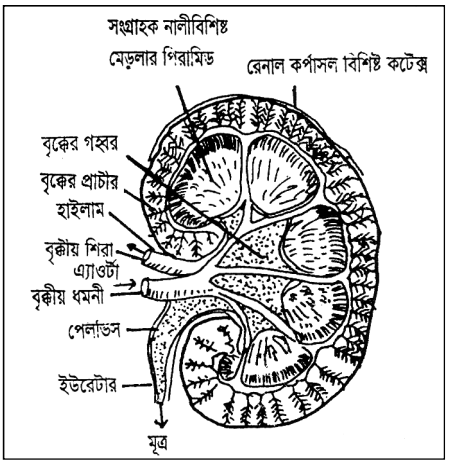

চিত্র ১৯.২.১ : (খ) বৃক্কের লম্বচ্ছেদ

১. বৃক্ক : মানুষের উদর গহ্বরের পিছনের দিকে মেরুদন্ডের দু'পাশে একটা করে মোট দুটো বৃক্ক অবস্থিত। প্রতিটি বৃক্ক সীমের বিচির মত আকৃতি বিশিষ্ট। এদের রঙ খয়েরী লাল। পূর্ণাঙ্গ মানুষের প্রতিটি বৃক্ক লম্বায় প্রায় ১১-১২ সে.মি, প্রস্থে ৫-৬ সে.মি এবং পুরুত্ব ৫ সে.মি.। বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল এবং ভিতরের দিক অবতল। বাম দিকের বৃক্কটা ডান দিকের বৃক্ক অপেক্ষা কিছুটা উপরে অবস্থান করে। বৃক্কের ভিতরের দিকের অবতল ফাঁকা গর্তের মত ভাজটাকে রিনাল সাইনাস বলে। প্রতিটা বৃক্ক যোজন টিস্যু গঠিত পেরিটোনিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এজন্য দেহগহ্বরে অবস্থান করলেও এটি দেহগহ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। বৃক্কের অগ্রপ্রান্তে এডরিনাল গ্রন্থি, টুপির মত আচ্ছাদন করে অবস্থান করে। রিনাল সাইনাসে অবস্থিত বৃক্কের অংশসমূহসহ সম্পূর্ণ সাইনাসকে হাইলাম (hilum) বলে। বৃক্কধমণী,স্নায়ু ইত্যাদি হাইলামের মধ্য দিয়ে বৃক্কের ভিতরে প্রবেশ করে। আবার একই পথে বৃক্ক শিরা,স্নায়ু, ইউরেটর ইত্যাদি বৃক্ক থেকে বেরিয়ে আসে। হাইলামের নিকটবর্তী ইউরেটরের প্রথম ও প্রশস্ত অংশকে পেলভিস (pelvis) বলে।

অন্তঃগঠন : একটি বৃক্ককে লম্বচ্ছেদ করলে দুটি অংশ দেখা যায়; যথা- ক. ক্যাপস্যুল সংলগ্ন কর্টেক্স ও খ. অন্তঃস্থ মেডুলা।

ক. কর্টেক্স : কর্টেক্স বৃক্কের বাইরের গাঢ়তর লালচে বাদামী অংশ। এতে ইউনিকেরাস নালীকার বোম্যান্স আবরক অংশ এবং গ্লোমেরুলাস অবস্থান করে।

খ. মেডুলা : মেডুলো গাঢ় এবং কিছুটা কালচে রঙের। এতে নেফ্রনের এসেনডিং নালী, ডিসেনডিং নালী, হেনলীর লুপ ও সংগ্রাহক নালী অবস্থান

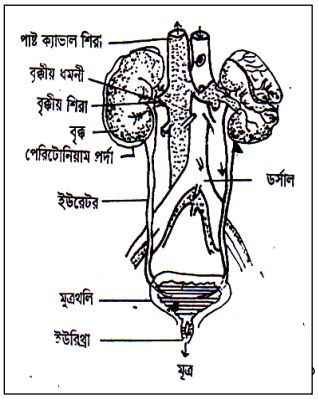

চিত্র ১৯.২.১ : (গ) মানুষের রেচনতন্ত্র

করে। মেডুলাতে কয়েকটা মোচাকৃতি খন্ডাংশ থাকে। এদেরকে পিরামিড (pyramid) বলে। পিরামিডগুলি ক্যালিক্স নামে কতগুলি জালিতে প্রসারিত হয়। ক্যালিক্সগুলো পরবর্তীতে পেলভিসে উন্মুক্ত হয়। পেলভিস এরপর ইউরেটরে (ureter) উন্মুক্ত হয়।

নেফ্রনই বৃক্কের গঠনমূলক ও কার্যকরী একক। প্রতিটি বৃক্কের অভ্যন্তরে প্রায় বার লক্ষ নেফ্রন (nephron) থাকে। বৃক্কের নেফ্রনের মধ্যে মূত্র উৎপন্ন হয়। রক্ত থেকে ছাঁকন পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন যুক্ত বর্জ্য পদার্থ ও অন্যান্য পদার্থ নেফ্রনের বোমান্স ক্যাপস্যুলের গহ্বরে প্রবেশ করে, অর্থাৎ এখানেই রক্ত থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ বা মূত্র অপসারিত হয়ে রক্তের পরিশোধন ঘটে। পরে এ পদার্থসমূহ থেকে মূত্রের উপাদানসমূহ ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ বৃক্কীয় নালীকার প্রাচীরের কোষসমূহ দ্বারা শোষিত হয়।

নেফ্রন : নেফ্রন হচ্ছে বৃক্কের ইউনিফেরাস নালীকার ক্ষরণকারী অংশ ও কার্যকরী একক। প্রতিটি নেফ্রনকে দুটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়; যথা- বোমান্স আবরক ও বৃক্কীয় নালীকা।

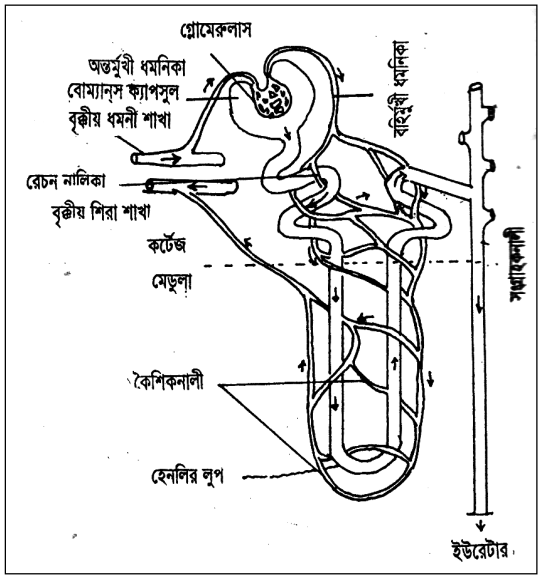

চিত্র ১৯.২-২ : নেফ্রনের সরল চিত্র

ক. বোমান্স আবরক : এটা নেফ্রনের সামনের অংশ। প্রতিটি বোমান্স আবরক স্কোয়ামাস আবরণী টিস্যু দ্বারা গঠিত গোলাকার কাপের মত অঙ্গ। এ কাপের মধ্যে গ্লোমেরুলাস (glomerulus) নামে রক্ত নালীগুচ্ছ অবস্থান করে। একটা বোমান্স আবরক এবং তার ভিতরের একটা গ্লোমেরুলাসের গুচ্ছকে একত্রে মালপিজিয়ান অঙ্গ বা বৃক্কীয় কণিকা (malphighian organ or renal corpuscle) বলে। মালপিজিয়ান অঙ্গ মেরুদন্ডী প্রাণিদের বৃক্কের কার্যকরী একক। বৃক্কীয় ধমনীর এক একটি এফারেন্ট শাখা পৃথক পৃথকভাবে বোমান্স আবরকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং গ্লোমেরুলাস বা কৈশিকনালীতে বিভক্ত হয়। কৈশিক নালীর মধ্যকার রক্তের মধ্যে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ বা মূত্রের উপাদান থাকে। গ্লোমেরুলাসের গহ্বরের রক্ত থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ বোম্যান্স আবরকের পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট কোষের মাধ্যমে ছাঁকন পদ্ধতিতে বোম্যান্স ক্যাপসুলের গহ্বরে প্রবেশ করে।

খ. বৃক্কীয় নালীকা : এটি নেফ্রনের পিছনের অংশ। বোম্যান্স আবরকের পরবর্তী নালীকাকার অংশকে বৃক্কীয় নালী (renal tube) বলে। এ নালীর মধ্য দিয়ে মূত্র সংগ্রাহক নালীর দিকে প্রবাহিত হয়। এ সময় বৃক্কীয় নালীর প্রাচীরের কোষসমূহ এ তরল থেকে প্রয়োজনীয় পানি ও অন্যান্য পদার্থ পুনঃশোষণ করে। মানুষের বৃক্কের নেফ্রনের হেনালীর লুপ (loop of henley) পুনঃশোষণ অঞ্চল বৃদ্ধি করে।

বৃক্কের কাজ

ক. বৃক্ক দেহ তথা রক্ত থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ বা রেচন পদার্থ অপসারণ করে।

খ. রক্তে অম্ল-ক্ষারকের সমতা রক্ষা করে।

গ. দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ. দেহে পানির সমতা রক্ষা করে।

ঙ. লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।

২. রেচননালী বা গবিনী বা ইউরেটর (Ureter) : প্রতিটি বৃক্কের ভিতরের দিক থেকে একটি করে নালী বের হয়ে তির্যকভাবে মূত্রথলির পিছনের প্রান্ত দিয়ে মূত্রথলির গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। এ নালী প্রায় ২৫-৩০ সে.মি.

লম্বা। রেচননালীর উৎপত্তিস্থল ফানেলের মত চওড়া, একে পেলভিস বলে। এ নালীর মাধ্যমে মূত্র বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে জমা হয়।

কাজ : মূত্রকে বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে বহন করে।

৩. মূত্রথলি : মূত্রথলি একটি ত্রিকোণাকৃতি থলিকাকার অঙ্গ। একটি শ্রেণী গহ্বরের ভিতরে অবস্থিত এবং সংকোচন- প্রসারণশীল পেশী দ্বারা গঠিত। মূত্রথলি সাধারণত ৭০০-৭৫০ মি.লি. মূত্র ধারণ করতে সক্ষম কিন্তু ২৮০-৩২০ মিলি.-এর চেয়ে বেশি মূত্র জমা হলে মানুষের মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মূত্র ত্যাগ করে।

কাজ : মূত্র সঞ্চয় করা ও সময়ে সময়ে মূত্র ত্যাগ করা।

৪. মূত্রনালী বা ইউরিথ্রা : পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে মূত্রথলির পশ্চাৎপ্রান্ত থেকে একটা নালী উৎপন্ন হয়ে লিঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লিঙ্গের অগ্রপান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এ নালীকে মূত্রনালী বা ইউরিথ্রা (Urethra) বলে। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে এ নালীর দৈর্ঘ্য ১৮-২০ সে.মি.। স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে মূত্রনালী একটি পৃথক নালী হিসেবে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এক্ষেত্রে এ নালীর দৈর্ঘ্য ৩.৫-৪ সে.মি.।

কাজ : ক. মূত্র নালীর মাধ্যমে মূত্র মূত্রথলি থেকে বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

খ. পুরুষের ক্ষেত্রে একই নালীপথে বীর্য তথা শুক্রাণু নিষ্কাশিত হয়, এজন্য পুরুষের ক্ষেত্রে এ নালীকে রেচন-জনন নালী (Urino-genital tube) বলা হয়।

সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগে প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ, অ্যালবুমেন (এক প্রকার আমিষ) বের হয়। নেক্সাইটিস বা বৃক্কের প্রদাহ রোগে মূত্রের সাথে রক্তের অ্যালবুমিন ও লোহিত কণিকা বের হয়ে আসে। সুস্থ অবস্থায় মূত্রের সাথে রক্তের এসব উপাদান থাকে না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব কারণে বৃক্ক কার্যকারীতা হারায়। বৃক্ক কার্যকারীতা হারালে বা কোনো কারণে বৃক্ক মূত্র তৈরিতে ব্যর্থ হলে, এ দূষিত পদার্থগুলো (বিশেষ করে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থসমূহ) রক্তের সাথে মিশে যায়, এভাবে কয়েকদিন চললে রেগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। বর্তমানে একটি বিশেষ যন্ত্রের (বৃক্ক মেশিন) সাহায্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্তের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে ডায়ালাইসিস বলে। এক্ষেত্রে যন্ত্রটিকে বাহুর রক্তনালীর সাথে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন এর ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে পারে। এসব রোগীর আমিষ জাতীয় খাদ্য কম খাওয়া উচিত। তাছাড়া এ যন্ত্রটি কয়েকদিন পরপর জীবানুমুক্ত করার প্রয়োজন পড়ে।

এছাড়া কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরপরই তার বৃক্ক সংগ্রহ করে অসুস্থ ব্যক্তির বৃক্ক সরিয়ে সেখানে প্রতিস্থাপন করে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে একটি বিষয় অবহিত হওয়া দরকার যে, যে কোনো ব্যক্তির একটি বৃক্ক ঠিকমত কাজ করলেই সে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- যে প্রক্রিয়ায় প্রাণিকোষে বিপাকের ফলে সৃষ্ট নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ দেহ হতে দ্রুত ও নিয়মিত নিষ্কাশিত হয়, তাকে রেচন বলে।
- যে সব অঙ্গ রেচন কাজে অংশগ্রহণ করে তাদেরকে রেচন অঙ্গ বলে। যে সুনির্দিষ্ট অঙ্গতন্ত্র রেচনের সাথে জড়িত থাকে তাকে রেচনতন্ত্র বলে।
- মানবদেহে রেচন অঙ্গ হিসেবে ত্বক, ফুসফুস, যকৃত ও বৃক্ক উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বৃক্ককে প্রধান রেচন অঙ্গ বলা হয়।
- মানুষের রেচনতন্ত্র বৃক্ক, রেচননালী, মূত্রথলি ও মূত্রনালীর সমন্বয়ে গঠিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি প্রধান রেচন অঙ্গ?

ক. ত্বক খ. বৃক্ক গ. ফুসফুস ঘ. যকৃত

২. একটি বৃক্কে কি পরিমাণ নেফ্রন থাকে?

ক. প্রায় ১৪ লক্ষ খ. প্রায় ১৫ লক্ষ গ. প্রায় ১২ লক্ষ ঘ. প্রায় ১৩ লক্ষ

৩. বৃক্কের মাধ্যমে কোন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশিত হয়?

ক. নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য খ. কার্বন ডাই-অক্সাইড গ. পিত্ত রঞ্জক ঘ. ঘাম

৪. বৃক্কের মাধ্যমে শতকরা কত অংশ রেচনকার্য ঘটে?

ক. ৬০ শতাংশ খ. ৬৫ শতাংশ গ. ৭০ শতাংশ ঘ. ৭৫ শতাংশ

৫। বৃক্ষের গঠন ও কার্যকরী একক কোনটি?

ক. নেক্সন খ. গ্লোমেরুলাস গ. পিরামিড ঘ. মেডুলা

৬. হেনলীর লুপ কিসের সাথে জড়িত?

ক. জননতন্ত্র খ. স্নায়ুতন্ত্র গ. পেশীতন্ত্র ঘ. রেচনতন্ত্র।

পাঠ ১৯.৩

স্নায়ুতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- অনুভূতি ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্নায়ু কোষের গঠন ব্যখ্যা করতে পারবেন;
- স্নায়ুকোষের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- স্নায়ুতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার নিরূপণ করতে পারবেন।

স্নায়ুতন্ত্র

বিবর্তনের গতিপথে এককোষী জীব যখন বহুকোষী জীবে পরিণত হয়েছে তখন দেহের সবখানে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে থাকা অগণিত কোষের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা এবং পরিবেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী দূত স্নায়ুতন্ত্র। স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়েছে মেরুদন্ডী প্রাণিতে। মেরুদন্ডী প্রাণিরা আজ পৃথিবীতে প্রাধান্যকারী গোষ্ঠী। এ আধিপত্যের অন্যতম কারণ উন্নত মস্তিষ্ক। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক। স্নায়ুতন্ত্রের একক নিউরোন, আর অসংখ্য নিউরোন নিয়ে গঠিত হয়েছে মস্তিষ্ক।

প্রাণিদেহের যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে, বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে, সে তন্ত্রকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।

দেহের সকল তন্ত্র যেমন জীবকোষ দ্বারা গঠিত, স্নায়ুতন্ত্রও তেমন অসংখ্য স্নায়ুকোষ দ্বারা গঠিত। এ কোষগুলি মস্তিষ্কের বহিরাংশে মেরুমজ্জার মধ্যভাগে ও স্নায়ুগ্রন্থি এ তিন স্থানে অবস্থিত। প্রতিটি স্নায়ুকোষের প্রধান বাহু ক্রমশ লম্বা হয়ে অপর স্নায়ুকোষের চারিদিকে শেষ হয়। এ সংযোগস্থলকে সিন্যাপ্সি (synapse) বলে। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে এরূপ অনেকগুলো দীর্ঘ বাহুর সমষ্টিস্নায়ু নামে অভিহিত হয়।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করা হয়; যথা- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র

স্নায়ুতন্ত্রের যে অংশ দেহের কেন্দ্র বা অক্ষ বরাবর অবস্থিত থাকে, তাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে।

মস্কিষ্ক ও মেরুমজ্জা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। মস্তিষ্ক করোটির করোটিকা বা ক্রানিয়াম (brain box) নামে অস্থিগঠিত বক্সের মধ্যে অবস্থিত এবং মেরুমজ্জা মেরুদন্ডের নিউরাল নালীর ভিতরে অবস্থিত। মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা তিনটি পাতলা আবরণী বা পর্দা আবৃত। এ পর্দা তিনটিকে একত্রে মেনিনজেস (meninges) বলে। বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে এ পর্দাগুলো হলো- ডুরা ম্যাটার, এরাক্নয়েড ম্যাটার ও পায়াম্যাটার।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চলের অভ্যন্তরে কতকগুলো গহ্বর থাকে। এদেরকে মস্তিষ্কের নিলয় বা গহ্বর (ventricles of (brain) বলে। মেরুমজ্জাও ফাঁপা, এর ভিতরের সরু নালিকাকার ফাঁকাটাকে কেন্দ্রীয় নালী (central canal) বা নিউরোসিল বলে। কেন্দ্রীয় নালী সামনের দিকে মস্তিষ্কের গহ্বর সমূহের সাথে যুক্ত থাকে। মস্তিষ্কের

গহ্বরসমূহ এবং কেন্দ্রীয় নালী সেরিব্রোস্পাইনাল রস (cerebro-spinal fluid = c.s.f) দ্বারা পূর্ণ থাকে। এদের দ্বারা চিন্তা, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ও দেহের যাবতীয় বাহ্যিক কার্যের সমন্বয় সাধন হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে সামনের অংশ বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়ে মস্তিষ্কে পরিণত হয়েছে। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র। মানুষের মস্তিষ্ককে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়; যথা- (ক) অগ্র মস্তিষ্ক বা প্রোজেন সেফালন, (খ) মধ্য মস্তিষ্ক বা মেজেন সেফালন ও (গ)পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা রম্বেন সেফালন।

ক. অগ্র মস্তিষ্ক : মস্তিষ্কের সবচেয়ে বৃহৎ অংশ অগ্রমস্তিষ্ক। এ অংশ সেরিব্রাম ও ডায়েনসেফালন নিয়ে গঠিত। এতে আছে থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, ডান গহ্বর, বাম গহ্বর ও তৃতীয় গহ্বর।

অগ্রমস্তিষ্কের মধ্যে সেরিব্রাম সবচেয়ে বড় অংশ। এটি সমস্ত মস্তিষ্কের অর্ধেকের বেশি অংশ দখল করে আছে। সেরিব্রাম ডান ও বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার (cerebral hemisphere) নামক দুটি অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত লোবের সমন্বয়ে গঠিত। উপরিভাগে একটি গভীর স্নায়ুখাজ দ্বারা হেমিস্ফিয়ার দুটি পৃথক থাকলেও একটি প্রশস্ত স্নায়ুতন্তুগুচ্ছ দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। এ স্নায়ুগুচ্ছকে কর্পাস ক্যালোসাম বলে। মানুষের সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার চারটি অংশে বিভক্ত; যথা- ফন্টাল লোব, প্যারাইটাল লোব, টেম্পোরাল লোপ ও অক্সিপিটাল লোব। সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার যে কোনো প্রাণি অপেক্ষা মানব মস্তিষ্কে অধিকতর সুগঠিত ও উন্নত। এটি ব্যাপক কুন্ডলীকৃত ও খাঁজ বিশিষ্ট। এর উপরিস্তরের ২-৪ মি.মি অংশকে সেরিব্রাল কর্টেক্স (cerebral cortex) বলে। এ অংশ লক্ষ লক্ষ বহু মেরুবিশিষ্ট নিউরনের কোষদেহ সম্বলিত গ্রে-ম্যাটার (gray matter) দ্বারা গঠিত। কর্টেক্সের নিচে হোয়াইট-ম্যাটার (white matter) থাকে। বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান অংশ এবং ডান সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম অংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

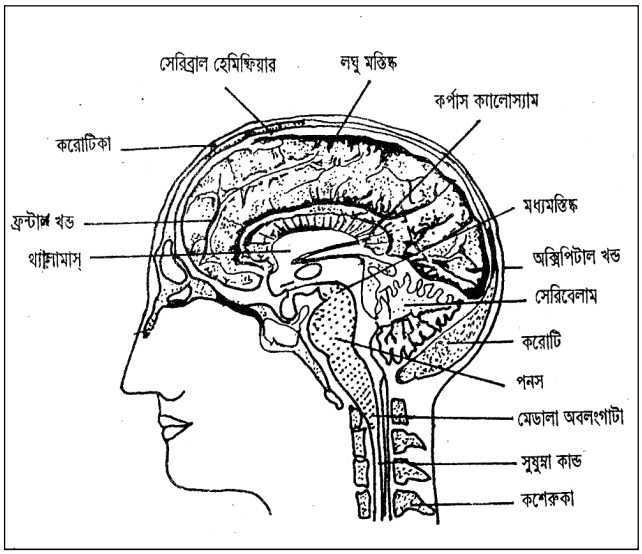

চিত্র ১৯.৩-১ : মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ

থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস : থ্যালামাল ডায়েন সেফালনের গ্রে-ম্যাটারের পুঞ্জ। মস্তিষ্কে বিভিন্ন অংশের সাথে থ্যালামাস অসংখ্য স্নায়ুতন্তু দ্বারা যুক্ত থাকে। হাইপোথ্যালামাস ডায়েনসেফালনের অপর একটি অংশ। থ্যালামাস ও পিটুইটারী বডি বা হাইপোফাইসিসের মধ্যবর্তী স্থানে হাইপোথ্যালামাস অবস্থিত। থ্যালামাসের মত এক অংশটি গ্রে-ম্যাটারের পুঞ্জ বা নিউক্লিয়াস সমন্বয়ে গঠিত। হাইপোথ্যালামাসের অঙ্কীয়দেশ পিটুইটারী বডির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : কথন, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শানুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো অগ্রমস্তিষ্ক দ্বারা সম্পন্ন হয়। সেরিব্রামের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকান্ডগুলোর স্থান সন্নিবেশিত থাকে। থ্যালামাস সংবেদী স্নায়ু উদ্দীপনার রিলে হিসেবে কাজ করে। হাইপোথ্যালামাস ক্রোধ, ভীতি প্রভৃতি আবেগময় কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল।

খ. মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেন সেফালন : হাইপোথ্যালামাসের নিচের অংশ বা সেরিবেলামের সম্মুখে পনস ও মেডুলার মধ্যবর্তীস্থানকে মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেনসেফালন বলে। এটি চারটি লোব নিয়ে গঠিত; এদেরকে কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা ও সেরিব্রাল পেডাঙ্কল বলা হয়। মস্তিষ্কে তৃতীয় ও চতুর্থ ভেন্টিকলের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত নালীর সাহায্যে মধ্যমস্তিষ্ক সংযোগ রক্ষা করে। মধ্যমস্তিষ্কের ঠিক উপরে অপটিক লোব অবস্থিত।

কাজ : মধ্য মস্তিষ্কের সম্মুখ লোব দুটি দৃষ্টি গ্রাহক কেন্দ্র এবং পশ্চাৎ লোব দুটি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাথে সংযুক্ত।

গ. পশ্চাৎ মস্তিষ্ক বা রম্বেনসেফালন : পশ্চাৎ মস্তিষ্কের প্রধান অংশ হল- সেরেবেলাম, পনস ও মেডুলা অবলঙ্গাটা। সেরেবেলাম পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ এবং দুটি সমগোলার্ধ নিয়ে গঠিত। দুটি গোলার্ধ ভার্মিস নামে যোজকের সাহায্যে যুক্ত থাকে। সেরেবেলাম তিনটি তন্তুগুচ্ছ দিয়ে মস্তিষ্ক কান্ডের পিছনে যুক্ত থাকে একে পেডাঙ্কল বলে। পনস সেরেবেলামের সামনে অবস্থিত এবং ব্যাসিলার ও টেগমেন্টাম অংশ নিয়ে গঠিত। মস্তিষ্কের প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা পেছন দিকের ঢালু অংশকে বলা হয় মেডুলা অবলঙ্গাটা। এর তলদেশে দুটি পিরামিড ও দু'পাশে ওলিভ থাকে।

কাজ : ক) সেরেবেলাম ঐচ্ছিক পেশীর টান নিয়ন্ত্রণ করে।

খ) পনস স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গ) মেডুলা অবলঙ্গাটা সংবেদন স্থানান্তরে যোগসূত্র রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র

মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন ১২ জোড়া করোটিকস্নায়ু এবং মেরুমজ্জা থেকে উদগত ৩১ জোড়া মেরুস্নায়ু নির্গত হয়ে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে একত্রে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র বলে। মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন স্নায়ুগুলি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ফুসফুস, দাঁত, মুখমন্ডল, হৃদপিন্ড, পাকস্থলী প্রভৃতির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে মেরুমজ্জা থেকে উদ্ভুত স্নায়ুগুলি অঙ্গ- প্রতঙ্গ চালনা করে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দেহের বিভিন্ন অন্তঃঅঙ্গ সমূহের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেহের দৈনন্দিন রুটিন কাজকর্মের সমন্বয় সাধন করে মূলত বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ অঙ্গ যেমন- পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত, জরায়ু ও রক্তনালী প্রভৃতি অনৈচ্ছিক মাংশপেশী ও দেহগ্রন্থী-এর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের কাজ মানুষের ইচ্ছাধীন নয়।

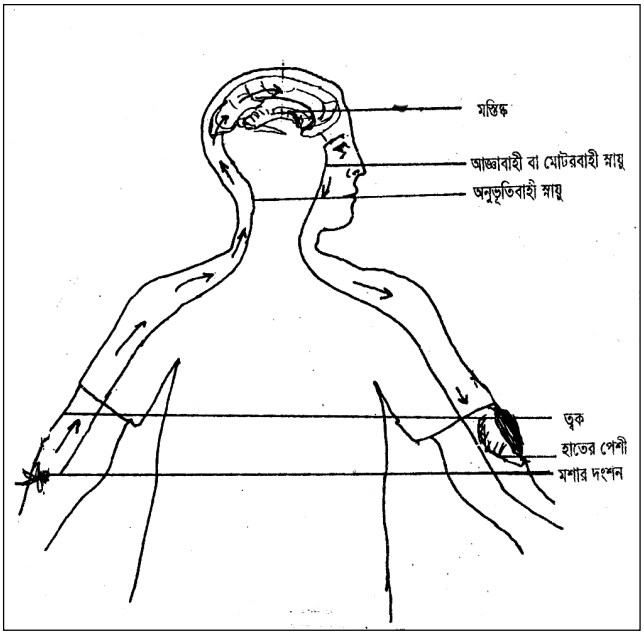

চিত্র ১৯.৩-২ : স্নায়ু সমন্বয় ব্যবস্থা (মশার কামড়ে উদ্দীপক ঐচ্ছিক পেশীর সারা প্রদান)

অনুভূতি ব্যবস্থা

অনুভূতিবাহী স্নায়ুর গ্রাহক প্রান্ত থাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকে। পক্ষান্তরে অনুভূতিহীন কেন্দ্রমুখী স্নায়ুপ্রান্ত থাকে শরীরের সকল অভ্যন্তরীণ অঙ্গে। অনুভূতিবাহী স্নায়ুর কার্যক্রম স্নায়ু-তাড়না বহন করে মেরুরজ্জু হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য স্নায়ুতন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেহ চলে দুই পরিবেশের উদ্দীপনা এবং সাড়া জাগানোর ফলে। দেহের বাইরের জগৎ হল বাহ্যিক পরিবেশ এবং দেহের ভেতর হল অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। বাহ্যিক পরিবেশের উদ্দীপক হল আলো, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ (চাপ, ব্যথা, তাপ প্রভৃতি)। এরা যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের অনুভূতিবাহী স্নায়ুপ্রান্তে উদ্দীপনা বা নাড়া দেয়। অভ্যন্তরীণ পরিবেশের উদ্দীপক হল- চাপ, তাপ ও বিভিন্ন

রাসায়নিক বস্তু। এরা অভ্যন্তরীণ অঙ্গের কেন্দ্রমুখী প্রান্তে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যে কোনো উদ্দীপক অনুভূতিবাহী ও কেন্দ্রমুখী স্নায়ুতে তাড়না সৃষ্টি করে। এ তাড়না অনুভূতিবাহী স্নায়ুপথে মস্তিষ্কে পৌঁছে। মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত নিয়ে আজ্ঞাবাহী বা মোটর স্নায়ুযোগে পুনরায় তাড়না পাঠিয়ে পেশী কিংবা গ্রন্থিতে সাড়া জাগায় অর্থাৎ কাজ করায়।

স্নায়ুকোষ

দেহের সকল তন্ত্র যেমন জীবকোষদ্বারা গঠিত, তেমনিভাবে স্নায়ুতন্ত্রও অসংখ্য কোষ দ্বারা গঠিত, এদেরকে স্নায়ুকোষ বলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে স্নায়ুতন্ত্রের মৌলিক উপাদান বা একক হল স্নায়ুকোষ। এ কোষগুলি মস্তিষ্কের বহিরাংশে, মেরুমজ্জার মধ্যভাগে ও স্নায়ুগ্রন্থি এ তিনস্থানে অবস্থান করে। মানুষের মস্তিষ্কে কয়েক কোটিস্নায়ু কোষ আছে যাদের প্রতিটি আবার হাজারখানেক স্নায়ুকোষের সাথে যুক্ত হয়ে গঠন করেছে একটি জটিলস্নায়ু জালিকা।

গঠন : স্নায়ুকোষের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্য স্বাভাবিক দেহকোষ হতে ভিন্নতর হলেও, কোষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ন্যায় এদেরও রয়েছে একটি সুস্পষ্ট বৃহৎ নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসকে ঘিরে আছে প্রায় একমিটার দীর্ঘ সূত্রাকার সাইটোপ্লাজম। অর্থাৎ প্রতিটি স্নায়ুকোষ, একটি কোষদেহ ও দুধরনের প্রলম্বিত তন্তু নিয়ে গঠিত। ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখাযুক্ত তন্তুগুলোকে ডেনড্রাইট (dendrite) এবং শাখাবিহীন লম্বা তন্তুটিকে অ্যাক্সন (axone) বলে। অ্যাক্সন প্রান্তীয়ভাবে স্নায়ুতন্তু গঠন করে। অ্যাক্সন একটি পুরু শ্বেতবর্ণের আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে। এ আবরণকে মায়েলিন বলে। আবরণটি সমদূরত্বে স্থানে স্থানে বিভক্ত থাকে, একে র‍্যানভিয়েন নোডস বলে।

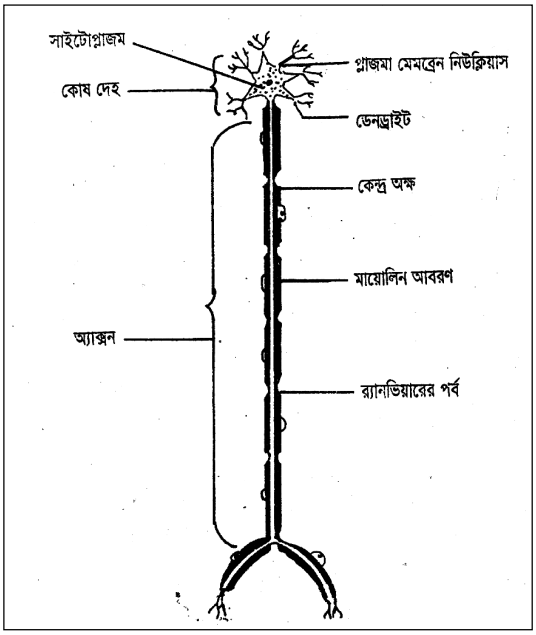

চিত্র ১৯.৩-৩ : একটি নিউরণ

কাজ : স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনুভূতি কেবলমাত্র একদিকে বাহিত হয়। কোষদেহ থেকে অ্যাক্সনের মাধ্যমে অনুভূতি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাতে পৌঁছে। এ অন্তর্মুখী স্নায়ুকোষগুলোকে সংবেদী স্নায়ুকোষ বলে। পরে প্রান্তীয়ভাবে সংযুক্ত অপর এক ধরনের বহির্মুখী স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনুভূতি উদ্দীপনাস্থলে ফিরে আসে। এ স্নায়ুকোষগুলোকে চেষ্টীয় স্নায়ুকোষ বলে। সম্পূর্ণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে।

স্নায়ুতন্ত্রের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

স্নায়ুতন্ত্রের সাধারণ রোগসমূহ নিম্নরূপ-

১. মাথা ব্যথা : কারণ অনুসন্ধান করে বেদনানাশক ওষুধ সেবন করা।

২. অজ্ঞান হওয়া : ক. মাথা উপরে রাখতে হবে।
খ. চোখে-মুখে পানি ছিটায়ে দিতে হবে।
গ. বিশ্রাম নিতে হবে।

৩. মেনিনজাইটিস : এটি ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসজনিত রোগ। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেতে হবে।

৪. স্টোক : উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে হয়ে থাকে। এর ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা জরুরি নতুবা মৃত্যু অনিবার্য।

৫. মৃগিরোগ : স্নায়ুতন্ত্রে সাধারণ বৈকল্য। এক্ষেত্রে রোগী হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এ সময়

সমস্ত দেহে পেশীর সংকোচন-প্রসারণ ঘটে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে।

৬. পক্ষাঘাত : উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগ। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে।

৭. ব্রেইন টিউমার : অভিজ্ঞ ডাক্তারের সহায়তায় অপারেশন করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- প্রাণিদেহের যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে, বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করে, তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে।
- মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা- কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।
- মানুষের মস্তিষ্ককে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়; যথা- অগ্র মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক ও পশ্চাৎ মস্তিষ্ক।
- অনুভূতিশীল স্নায়ুর গ্রাহক প্রান্ত থাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে। পক্ষান্তরে অনুভূতিহীন কেন্দ্রমুখী স্নায়ুপ্রান্ত থাকে শরীরের সকল অভ্যন্তরীণ অঙ্গে।
- যে কোষ দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র গঠিত তাদেরকে স্নায়ুকোষ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. স্নায়ুতন্ত্রের গঠনগত ও কার্যগত এককের নাম কি?

ক. নেফ্রন খ. নেফ্রিডিয়াম গ. নিউরন ঘ. নিউরোগ্লিয়া

২. স্নায়ুতন্ত্রকে কতভাগে ভাগ করা হয়?

ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

৩. কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্র কয়টি অংশ নিয়ে গঠিত?

ক. দুইটি খ. তিনটি গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৪. মস্তিষ্কে করোটিক স্নায়ুর সংখ্যা কত?

ক. ৯ জোড়া খ. ১০ জোড়া গ. ১১ জোড়া ঘ. ১২ জোড়া

৫. হাইপোথ্যালামাসের অঙ্গীয়দেশ কিসের সাথে যুক্ত থাকে?

ক. সেলিব্রাম খ. সেরিবেলাম গ. ডায়েনসেফালন ঘ. পিটুইটারী বডি

৬. নিচের কোনোটিতে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র ক্রিয়াশীল নয়?

ক. হাত খ. পাকস্থলী গ. ক্ষুদ্রান্ত ঘ. জরায়ু।

পাঠ ১৯.৪

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র, সংবেদনশীল অঙ্গ (চোখ)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- এদের কাজসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন;
- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সাধারণ রোগ ও প্রতিকার আলোচনা করতে পারবেন;
- চোখের গঠন প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- চোখের কাজ লিখতে পারবেন;
- চোখের সাধারণ রোগ ও প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

গ্রন্থি

গঠনগত ও কার্যগতভাবে কতকগুলো কোষ সংঘবদ্ধ হয়ে যখন এমন কোনো অঙ্গ গঠন করে যা শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ বা রস নিঃসরণ করে তাকে গ্রন্থি বলে। দেহের মধ্যে এ প্রকার বহু গ্রন্থি আছে। এগুলো হতে সময়মত নানা প্রকার রসের ক্ষরণ হয়ে দেহের বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ক্ষরণ পদ্ধতি ও গ্রন্থিতে নালীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে গ্রন্থিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়; যথা- বহিঃক্ষরা গ্রন্থি ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি : যে সকল গ্রন্থি তাদের দেহর থেকে নিঃসৃত রস নালীকার মাধ্যমে দেহের অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়, তাদেরকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। যেমন- মানুষের লালাগ্রন্থি, যকৃত ইত্যাদি।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি : যে সকল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস সরাসরি রক্ত বা লসিকার সাথে মিশে যায় এবং রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দেহের কার্যকর স্থানে স্থানান্তরিত হয়, তাদেরকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। এ সকল গ্রন্থির কোনো নালীকা নেই এ কারণে এদেরকে অনালগ্রন্থি (ductless glands)-ও বলা হয়। যেমন- পিটুইটারী গ্রন্থি।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সমন্বয়ের জন্যে যেমন স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা রয়েছে, অনুরূপভাবে গ্রন্থিতন্ত্রের গুরুত্বও উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে দেহের আন্তঃসাম্যের জন্যে স্নায়ুতন্ত্র ও গ্রন্থিতন্ত্র একসাথে কাজ করে।

মানবদেহের প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো হল- পিটইটারী গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি, থাইমাস গ্রন্থি, অগ্নাশয়ের গ্রন্থি, শুক্রাশয়ের অনালী অংশ, ডিম্বাশয়ের অনালী অংশ ইত্যাদি।

এসব অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের সমন্বয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ তন্ত্র গঠিত হয়, তাকে অন্তঃগ্রন্থিতন্ত্র (the endocrine system) বলে।

পিটুইটারী গ্রন্থি : অগ্রমস্তিষ্কে অবস্থিত সকল গ্রন্থি নিয়ন্ত্রণকারী একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থি অবস্থিত, একে পিটুইটারী গ্রন্থি বলে। এটি দেখতে অনেকটা মটর দানার মত। এটি অগ্রবর্তী অঞ্চল, মধ্যবর্তী অঞ্চল ও পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে বিভক্ত। পিটুইটারী প্রাণিদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনালগ্রন্থি। এ গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনগুলো দেহের অন্যান্য অনাল গ্রন্থির ক্ষরণ ও কার্যকারীতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এজন্য পিটুইটারী গ্রন্থিকে গ্রন্থি রাজ (mastergland) বলা হয়।

কাজ : পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখ অঞ্চল হতে নিম্নলিখিত হরমোন নিঃসৃত হয়; যথা- বৃদ্ধি উদ্দীপক হরমোন, অ্যাড্রিনাল উদ্দীপক হরমোন, থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন, ফলিকল উদ্দীপক হরমোন, ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ

উদ্দীপক হরমোন।

থাইরয়েড গ্রন্থি : শ্বাসনালীর উভয় পাশে হরিদ্রাভ লাল বর্ণের যে দুটি পিন্ডের ন্যায় গ্রন্থি উপস্থিত থাকে, তাকে থাইরয়েড গ্রন্থি বলে। এদের ওজন প্রায় ২০-২৫ গ্রাম। এটি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে অধিক স্পষ্ট। থাইরয়েড গ্রন্থি ঘনতলীয় আবরণী কোষ টিস্যু দ্বারা পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় গোলাকার থলি বা ভেসিকল দ্বারা গঠিত। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তিন ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়; যথা- থাইরক্সিন, ট্রাইআয়োডো থাইরোনিন ও থাইরোক্যালসিটোনিন।

কাজ : ক. অক্সিজেন গ্রহণে ও শক্তি উৎপাদনে কোষকে উদ্দীপিত করে।

খ. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

গ. থাইরক্সিনের অভাবে দৈহিক বৃদ্ধি, দেহ ও মনের পরিপূর্ণতা ব্যাহত হয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি : থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতির দু'জোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি অবস্থিত। এ গ্রন্থি থেকে প্যারাথরমোন ক্ষরিত হয়।

কাজ : ক. ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস পরিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. এর অভাবেস্নায়ু ও পেশীর অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। পেশীর খিচুনী শুরু হয়। এ অবস্থাকে টিটেনি বলে।

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি : প্রতিটি বৃক্কের মাথায় টুপির মত একটি করে মোট দুটি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি আছে। প্রতিটি গ্রন্থির বাইরের হলুদ অংশকে কর্টেক্স এবং ভিতরের পিঙ্গল বর্ণের অংশকে মেডুলা বলে। এদের ওজন প্রায় ৩-৫ গ্রাম।

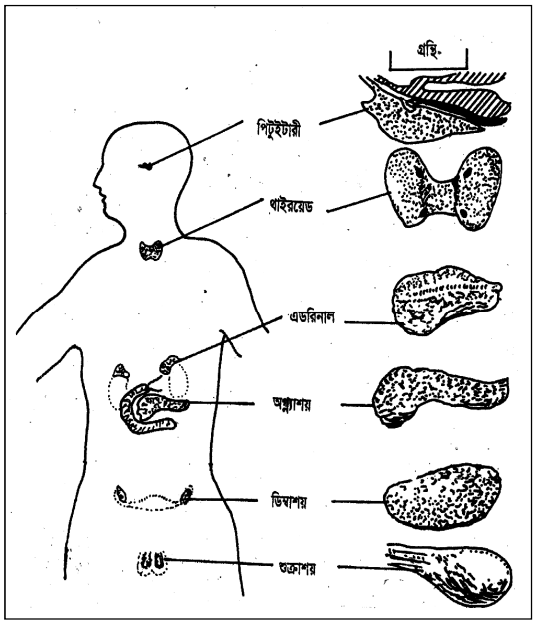

চিত্র ১৯.৪-১: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র

অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অংশ থেকে শর্করা কর্টিকয়েড, খনিজ কর্টিকয়েড ও যৌন কর্টিকয়েড এবং মেডুলা অংশ থেকে অ্যাড্রিনালিন ও নন-অ্যাড্রিনালিন প্রভৃতি হরমোন ক্ষরিত হয়।

কর্টেক্স অংশ থেকে নিঃসৃত হরমোন আমিষ বিশ্লেষণে সহায়তা করে এবং মেডুলা অংশ থেকে নিঃসৃত হরমোন স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে।

থাইমাস গ্রন্থি : গলার নিচের বুকের মধ্যে অবস্থিত গোলাপী বর্ণের একজোড়া গ্রন্থিকেই থাইমাস গ্রন্থি বলে। শৈশবে এ গ্রন্থিটি বেশ বড় থাকে এবং হৃদপিন্ডের কিছু অংশ ঢেকে রাখে, কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটি ছোট হয়ে যায়। থাইমাস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন হল, থাইমোসিন।

কাজ : ক. এ গ্রন্থি লিমেকাসাইট সৃষ্টি করে দেহের রোগ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (immunity) নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. কিশোর অবস্থায় যৌন গ্রন্থি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

অগ্নাশয়ের গ্রন্থি : অগ্নাশয়ে অবস্থিত বিশেষ ধরনের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স বলে। এ গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন, গ্লুকাগণ, গ্যাস্টিন, সোমাটোষ্ট্যাটিন প্রভৃতি হরমোন নিঃসৃত হয়।

কাজ : ক. ইনসুলিনের প্রভাবে যকৃত ও পেশীতে গ্লাইকোজেন সঞ্চিত হয়।

খ. হে পদার্থ ও আমিষ হতে গ্লুকোজ উৎপাদন ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ করে।

শুক্রাশয়ের অনালী অংশ : শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালীকাগুলোর অন্তবর্তী অঞ্চলে লেডিগ-এর ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। শুক্রাশয় থেকে টেস্টোস্টেরণ ও সামান্য পরিমাণে ইনট্রোজেন হরমোন নিঃসৃত হয়।

কাজ : ক. টেস্টোস্টেরণ গৌণ যৌন অঙ্গ বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. যৌন চেতনা জাগায়।

ডিম্বাশয়ের অনালী অংশ : ডিম্বাশয়ের পরিণত গ্রাফিয়ান ফলিকল, মেমব্রেনা গ্র্যানুলোসা, থেকা ইন্টারণা এবং কর্পাস লটিয়ামের কোষগুলো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। ডিম্বাশয় থেকে ইস্টোজেন, প্রোজেস্ট্রেরণ ও রিলাক্সিন হরমোন নিঃসৃত হয়।

কাজ : ক. ইস্ট্রোজেন দুগ্ধক্ষরা গ্রন্থির আকৃতিগত পরিবর্তন করে।

খ. ইস্ট্রোজেন মাসিক ঋতুস্রাব নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. প্রোজেস্টেরণ গর্ভবতী অবস্থার লক্ষণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ. রিলাক্সিন শ্রেণীবন্ধনী শিথিল ও জরায়ুর পেশী সংকোচনে বাধার সৃষ্টি করে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

নিচে অন্তঃক্ষরাগ্রন্থি জনিত রোগগুলো উল্লেখ করা হল-

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাম বা বহুমূত্ররোগ : ইনসুলিনের অভাবে এ রোগ হয়ে থাকে। ইনসুলিন পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাৎ অংশ হতে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন বৃক্ক হতে পানি শোষণের পরিমাণ বাড়িয়ে প্রস্রাবের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, এমনকি দিনে দেড়-দুই লিটারের পরিবর্তে পঁচিশ লিটার পর্যন্ত হতে পারে। এ রোগে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, কিছু গ্লুকোজ মূত্রের সাথে বের হয়ে যায়; ফলে দেহের ওজন কমে যায়।

বহুমূত্র কোনো জীবাণুঘটিত রোগ নয়। পরিমিত ব্যায়াম এবং খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণ করে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ক্রিটিনিজম (Cretinism) : থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনের অভাবের কারণে এ রোগ হয়। বিশেষকরে এ রোগ শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। থাইরক্সিন হরমোনের অভাবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বন্ধ হয়। তাদের দেহ খর্বাকৃতি থাকে, দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকে ও তাদের মানসিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

পরিমিত মাত্রায় থাইরক্সিন প্রয়োগে উপকার হয়। আয়োডিনযুক্ত লবণ গ্রহণ করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

টিটেনি (Tetany) : প্যারা-থাইরয়েড থেকে নিঃসৃত প্যারা-হরমোন নামক হরমোনের অভাবে এ রোগ হয়। টিটেনি রোগের ফলে রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যায়। ফলে মাংসপেশীর খিচুনী ও কম্পন পরিলক্ষিত হয়। আবার এ হরমোনের আধিক্য হেতু রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অস্থি থেকে ক্যালসিয়াম রক্তে চলে আসে বলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় অস্থি তার কাঠিন্য হারিয়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ রোগ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

সংবেদনশীল অঙ্গ

প্রতিটি জীব তার নিজ নিজ পরিবেশ সম্বন্ধে সদা সচেতন। সতর্ক না হলে নিজের এবং নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। সংবেদন শক্তির মাধ্যমে জীব পরিবেশিক অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পারে। উচ্চতর মেরুদন্ডী প্রাণিতে সংবেদন শক্তি বেশি সুগঠিত। কারণ এদের রয়েছে উন্নত স্নায়ুতন্ত্র ও সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে সংবেদনশীল অঙ্গগুলিকে চালিত করে, ফলে এদের কার্যকারীতায় আমরা পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারি।

যে অঙ্গের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের অবস্থা, কার্যকারীতা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারি তাদেরকে সংবেদনশীল অঙ্গ বলে। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক-এ পাঁচটি হচ্ছে মানুষের সংবেদনশীল অঙ্গ। সাধারণ

ভাষায় এদেরকে পঞ্চইন্দ্রিয় বলা হয়।

চোখ

পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে চোখ হল দর্শন-ইন্দ্রিয়। বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত দর্শন ক্ষেত্র থেকে আসা বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘের প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখ গ্রহণ করে। এ আলোক তরঙ্গ বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় পরিণত হয় এবং অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পরিবাহিত হয়ে বস্তুর সুনির্দিষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। ফলে আমরা দেখতে পাই। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় আলোকের মাধ্যমে দৃষ্টি সঞ্চার করে তাকে চোখ বলে।

অবস্থান : মানুষের মুখমন্ডলের মাথার নিচে করোটির সামনের দিকে নাকের দু'পাশে একজোড়া অক্ষিকোটরের মধ্যে দুটি চোখ অবস্থিত। প্রতিটি চোখ ৬টি পেশী দ্বারা অক্ষিকোটরের মধ্যে আটকে থাকে। চোখের ৫/৬ ভাগের ১ ভাগ বাইরে উন্মুক্ত থাকে এবং অবশিষ্ট অংশ অক্ষিকোটরের ভিতরে থাকে। ল্যাক্সিমাল গ্রন্থি বা অশ্রুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল বা অশ্রু চোখকে সদা সিক্ত রাখে।

গঠন

১. চোখের পাতা : চোখের বর্হির্ভাগের আবরণ। চোখের পাতা দুটি।

কাজ : ক. উর্ধ্ব ও নিম্ন চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করার মাধ্যমে চোখে আলো প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. চোখকে বাইরের ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে।

গ. যান্ত্রিক বা রাসায়নিক ক্ষতি থেকে কর্ণিয়াকে রক্ষা করে।

২. কনজাংটিভা : চোখের পাতার নিচে এবং চক্ষু গোলকের উপরের পাতলা স্বচ্ছ ঝিল্লী আবরণী। চোখ ঘসলে বা চোখ উঠলে এটি লাল বর্ণের হয়।

৩. চক্ষুগোলক : ইহা গোলাকার বল আকৃতির অঙ্গ, চক্ষু কোটরে অবস্থিত। চক্ষুগোলককে প্রাথমিকভাবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়; যথা- (ক) সম্মুখ অংশ (খ) পশ্চাৎ অংশ।

ক. সম্মুখ অংশ :

i) **কর্ণিয়া:** স্ক্লেরার সামনে উন্মুক্ত অংশটিকে কর্ণিয়া বলে। এটি সামনে থেকে দেখতে ডিম্বাকার এবং পিছন থেকে দেখতে বৃত্তাকার। এ অংশটি ঘন যোজক তন্তুটিস্যু দ্বারা নির্মিত এবং রক্তজালিকাবিহীন হওয়ায় স্বচ্ছ।

   কাজ : স্বচ্ছতার কারণে অক্ষিগোলকের ভেতরে আলোবাহী অংশে যথাযথ আলো পৌঁছাতে পারে।

ii) **আইরিশ :** কর্ণিয়ার পিছনে উভয় পাশে বাড়ানো অস্বচ্ছ, গোল ও মধ্যে ছিদ্রযুক্ত কালো রঙের পর্দাকে আইরিস বলে। এটি কর্ণিয়ার পিছনে ও লেন্সের সম্মুখে অবস্থিত এবং দুধরনের অনৈচ্ছিক পেশীতে গঠিত। আইরিসের কেন্দ্রীয় ছিদ্রটিকে পিউপিল (pupil) বলে।
   কাজ : আইরিস পেশীর সংকোচন-প্রসারণের ফলে পিউপিল ছোট ও বড় হয়। পিউপিল পথে আলোকরশ্মি রেটিনায় প্রবেশ করে।

iii) **লেন্স :** এটি পিউপিলের পিছনে অবস্থিত ও সিলিয় অঙ্গের সাথে ঝুলন বন্ধনী যুক্ত হয়ে ঝুলে থাকা একটি স্বচ্ছ স্থিতিস্থাপক ও দ্বিউত্তল চাকতি বিশেষ। সিলীয় পেশীর সংকোচন ও প্রসারণে লেন্সটিও সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।
   কাজ : লেন্সের সাহায্যে আলোক রশ্মি বক্রতা প্রাপ্ত হয়ে রেটিনার উপর পড়ে।

অ্যাকুয়াস হিউমার : কর্ণিয়া ও আইরিসের মর্ধ্যবর্তী গহ্বরটি একধরনের ক্ষারীয় তরলে পূর্ণ থাকে। একে অ্যাকুয়াস হিউমার বলে।

কাজ : অক্ষিগোলকের অন্তঃস্থ চাপ ও সঠিক আকার বজায় রাখতে এ তরল সাহায্য করে।

আইরিস ও লেন্সের মধ্যবর্তী গহ্বরটিও অ্যাকুয়াস হিউমারে পূর্ণ থাকে।
কাজ : এটি লেন্সের পুষ্টি যোগায় এবং চোখের অন্তঃস্থ চাপ ও আকার বজায় রাখতে সহায়তা করে।

iv) **সিলিয় অঙ্গ :** আইরিস ও কোরয়েডের সংযোগস্থলে অবস্থিত স্থূল বলয়াকৃতি অংশকে সিলিয়া অঙ্গ বলে। একটি সিলিয় বলয়, সিলিয় প্রবর্ধক ও সিলিও পেশী নিয়ে গঠিত। চোখের লেন্স ঝুলন বন্ধনী দিয়ে সিলিও অঙ্গের সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সিলিও পেশীগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়। সিলিয় অঙ্গ অ্যাকুয়াস হিউমারও উৎপন্ন করে।

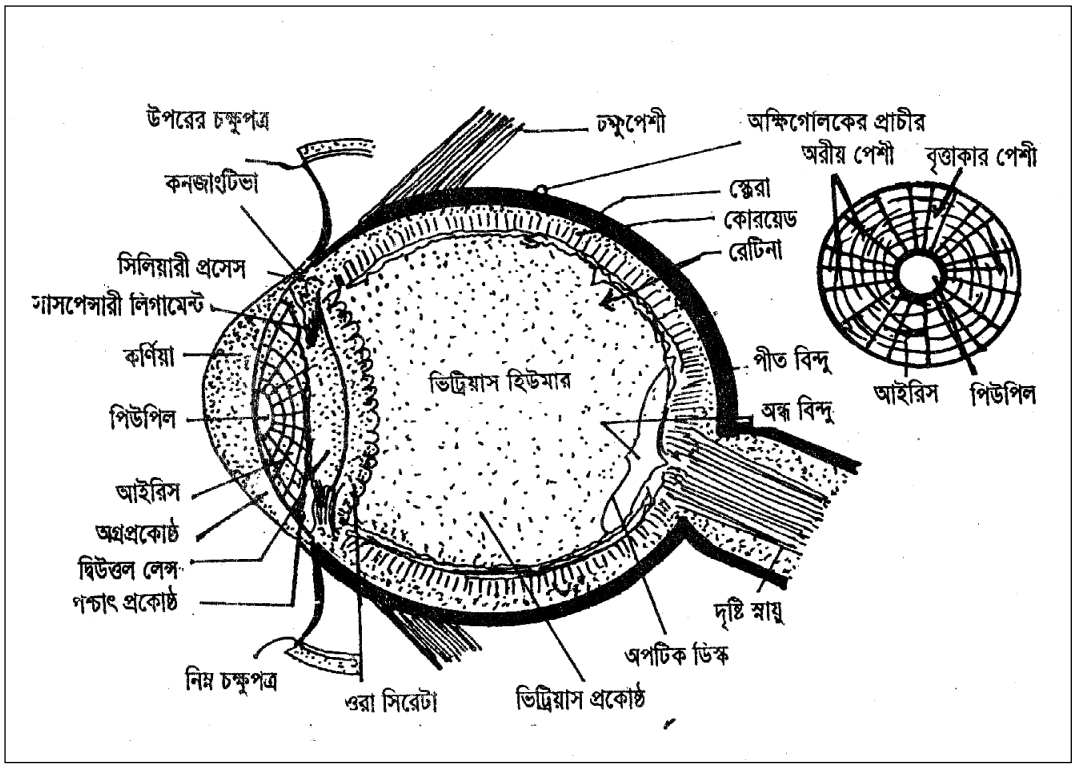

চিত্র ১৯.৪-২ : চোখের গঠন

খ. পশ্চাৎ অংশ : মানুষের অক্ষিগোলকের প্রাচীর তিনটি স্তরে বিভক্ত; যথা-

i) **স্ক্লেরা :** অক্ষিগোলকের বাইরের স্তরটির নাম স্ক্লেরা। এটি অস্বচ্ছ, শক্ত, সাদা ও তন্তুময় টিস্যু দ্বারা গঠিত। এ স্তরটি অক্ষি গোলকের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত। স্ক্লেরা সামনের দিকে বিস্তৃত হয়ে কর্ণিয়া গঠন করে।
কাজ : চোখের অভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মগঠনকে রক্ষা করে এবং কর্ণিয়ার মাধ্যমে আলোকরশ্মি রেটিনায় পাঠায়।

ii) **কোরয়েড :** কোরয়েড অক্ষিগোলকের দ্বিতীয় ও মধ্যবর্তী স্তর। এটি রক্ত বাহিকা সমৃদ্ধ যোজক টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত। কোরয়েড সামনের দিক প্রসারিত হয়ে আইরিস গঠন করে। আইরিস ও কোরয়েডের সংযোগস্থলে সিলিয়ারি বডি অবস্থিত। কোরয়েড স্তরে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এর রঙ কাল। এ কারণে এ অঞ্চলকে কৃষ্ণমন্ডল বলে।
কাজ : কোরয়েড চোখকে পুষ্টি যোগায়।

iii) **রেটিনা :** অক্ষিগোলকের সর্বাপেক্ষা ভেতরের স্তরকে বলে রেটিনা। এটি চোখের আলোক সংবেদী স্তর। এটি দু'প্রকার কোষ নিয়ে গঠিত। কোষগুলো হল, রড কোষ ও কোনো কোষ। রড কোষ মৃদু আলো শোষণে সক্ষম। কোনো কোষ উজ্জ্বল আলো এবং বর্ণ শোষণে সক্ষম। রেটিনায় বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়।

কাজ : এটি অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে এবং অক্ষিগোলকে প্রবিষ্ট আলোকের প্রতিসরণ ঘটায়।

অপটিকস্নায়ু : এটি দ্বিতীয় করোটিক স্নায়ু। এস্নায়ু অক্ষিগোলকের পিছনে রেটিনা ও মস্তিষ্ককে সংযুক্ত করে।
কাজ : রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব সম্পর্কে মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করে।

অক্ষিগোলকের গহ্বর : চোখের লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি গহ্বর বিদ্যমান। এ গহ্বরটি সবচেয়ে বড়, অক্ষিগোলকের প্রায় ৮০%। এ গহ্বর ভিট্রেয়াস হিউমার নামক জেলীর ন্যায় পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। ভিট্রেয়াস হিউমার ডিমের সাদা অংশের ন্যায় ঘন কিন্তু স্বচ্ছ।
কাজ : ভিট্রেয়াস হিউমার রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সহায়তা করে। অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে এবং রেটিনাকে সহায়তা করে।

অশ্রু গ্রন্থি : চোখের উপরের পাতার নিচে অশ্রুগ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে অশ্রু তৈরি হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও পানি সমন্বয়ে অশ্রু গঠিত। অশ্রুতে লাইসোজাইম এনজাইমও থাকে।
কাজ : অশ্রু চোখকে সিক্ত রাখে ও জীবাণু ধ্বংস করে।

চোখের রোগ ও প্রতিকার

নিচে চোখের বিভিন্ন রোগ ও তাদের প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল-

- হাইপারমেট্রোপিয়া বা দূরদৃষ্টি : লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী দূরত্ব স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কোনো কারণে হ্রাস পেলে প্রতিবিম্ব রেটিনার পেছনে সৃষ্টি হয়। ফলে লক্ষ্যবস্তুটি অস্পষ্ট দেখা যায়।
- উত্তল লেন্স নির্মিত চশমা ব্যবহার দ্বারা চোখের এ ত্রুটি দূরীভূত হয়।
- মায়োপিয়া বা অদূর-দৃষ্টি : লেন্স ও রেটিনার মাধ্যবর্তী দূরত্ব স্বাভাবিক অবস্থা হতে বৃদ্ধি পেলে রেটিনার সমানে প্রতিবিম্বটি সৃষ্টি হয়। ফলে লক্ষ্যবস্তু তথা দূরের বস্তু অস্পষ্ট দেখা যায়। অবতল লেন্স নির্মিত চশমা ব্যবহার দ্বারা চোখের এ ত্রুটি দূর করা সম্ভব।
- প্রেসবায়োপিয়া বা চালসে : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেন্সের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায় এবং সিলিয়ারী পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে অভিযোজন শক্তি হ্রাস পেয়ে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। এরূপ অবস্থাকে প্রেসবায়োপিয়া বা চালসে বলে। উপযুক্ত চশমা ব্যবহারের মাধ্যমে এর প্রতিকার সম্ভব।
- ক্যাটারাক্ট : বৃদ্ধ বয়সে চোখের লেন্সের উপর এক প্রকার বিশেষ পর্দা বা আবরণের সৃষ্টির ফলে লেন্স ঘোলাটে হয়ে যায়, একেই ক্যাটারাক্ট বলে। অস্ত্রোপচার ও বিশেষ লেন্স ব্যবহার দ্বারা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যায়।
- গ্লুকোমা : অক্ষিগোলকের জলীয় পদার্থ নির্গত না হতে পারলে ভেতরে চাপ সৃষ্টির ফলে একধরনের রোগ দেখা দেয়, একে গ্লুকোমা বলে। এ রোগে মানুষ প্রায়ই অন্ধ হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

- যে সকল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস বা হরমোন সরাসরি রক্ত বা লসিকার সাথে মিশে যায় এবং রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দেহের কার্যকর স্থানে স্থানান্তরিত হয়, তাদেরকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে। এ সকল গ্রন্থির কোনো নালিকা নেই এ কারণে এদেরকে অনালগ্রন্থিও বলা হয়।
- মানবদেহের প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলো হল- পিটুইটারী গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি, থাইমাস গ্রন্থি, অগ্নাশয়ের গ্রন্থি, শুক্রাশয়ের অনাল অংশ এবং ডিম্বাশয়ের অনাল অংশ ইত্যাদি।
- যে অঙ্গের মাধ্যমে আমরা পরিবেশের অবস্থা, কার্যকারীতা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারি তাদেরকে সংবেদনশীল অঙ্গ বলে। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক-এ পাঁচটি অঙ্গ মানুষের পঞ্চইন্দ্রিয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি?

ক. লালাগ্রন্থি খ. থাইমাস গ্রন্থি গ. যকৃত ঘ. পাকস্থলী

২. গ্রন্থিরাজ বলা হয় নিচের কোনটিকে?

ক. পিটুইটারী গ্রন্থি খ. থাইমাস গ্রন্থি গ. থাইরয়েড গ্রন্থি ঘ. প্যারা-থাইরয়েড গ্রন্থি

৩. থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে কোন হরমোন নিঃসৃত হয়?

ক. অ্যাড্রিনালিন খ. কর্টিকয়েড গ. নন-অ্যাড্রিনালিন ঘ. থাইরক্সিন

৪. ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসৃত হয় কোন অংশ থেকে?

ক. শুক্রাশয় অনালী অংশ খ. অগ্নাশয় গ্রন্থি

গ. ডিম্বাশয় অনালী অংশ ঘ. থাইমাস গ্রন্থি

৫. টিটেনি রোগ হয় কোন হরমোনের অভাবে?

ক. থাইরক্সিন খ. প্যারা হরমোন গ. ইনসুলিন ঘ. গ্লুকাগণ

৬. চোখের কোন অংশে প্রতিবিম্বটি সৃষ্টি হয়?

ক. কর্ণিয়া খ. আইরিস গ. স্ক্লেরা ঘ. রেটিনা।

পাঠ ১৯.৫

সংবেদনশীল অঙ্গ (কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংবেদনশীল অঙ্গসমূহের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন;
- এদের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- এদের সাধারণ রোগ ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

কান

কান প্রধানত শ্রবণ ইন্দ্রিয়, তবে দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে।

অবস্থান : মানুষের মাথার দু'পাশে ও চোখের পিছনে করোটি মধ্যস্থ শ্রুতিকোটরে দুটি কান অবস্থিত।

গঠন : প্রতিটি কান তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত; যথা- বহিঃকণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।

বহিঃকর্ণ : বহিঃকর্ণ আবার তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা-১. কর্ণছত্র বা পিনা, ২. কর্ণকুহর ও ৩. কর্ণপটহ বা টিম্পেনাম।

১. কর্ণছত্র বা পিনা : এটি মাথার দু'পাশে অবস্থিত ও তরুণাস্থি দ্বারা তৈরি কানের বাইরের প্রসারিত ও লোমশ অংশ। পিনার প্রায় মধ্যস্থলে মাথার সাথে একটা ছিদ্রপথ অবস্থিত। পিনা এমনভাবে গঠিত যে, এর মাধ্যমে পরিবেশ থেকে আগত শব্দ তরঙ্গসমূহ গৃহীত এবং ঘণীভূত হয়ে কানের ছিদ্রপথে মধ্যকর্ণের দিকে প্রবাহিত হয়। কিছু কিছু প্রাণি পিনা নড়াচড়া করতে পারে, যথা- গরু, গাধা ইত্যাদি। মানুষের কানের পিনা নড়াচড়া করে না।

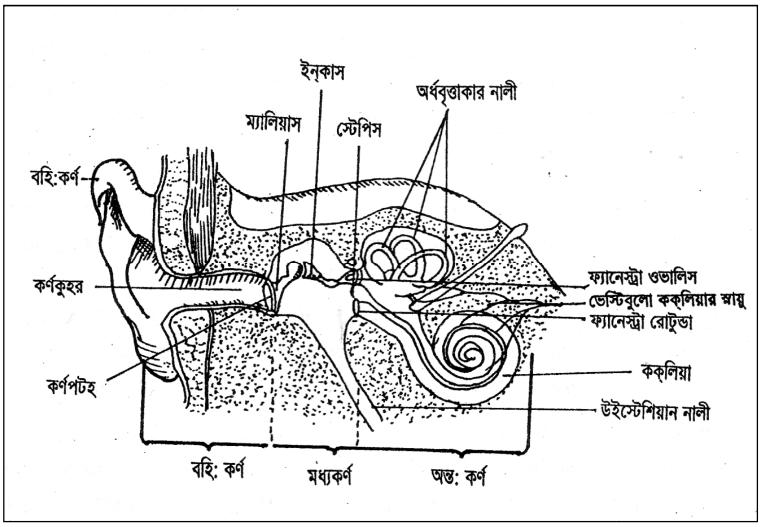

চিত্র ১৯.৫-১ : কর্ণের গঠন

কাজ : শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ ও ঘণীভূত করে কর্ণকুহরে প্রবেশ করা।

২. কর্ণকুহর : কর্ণছত্র বা পিনার কেন্দ্রে কানের বহিঃছিদ্র থেকে যে সরু নালীপথ কানের কর্ণপটহ পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে কর্ণকুহর বলে। এটি ত্বক দ্বারা আবৃত এবং তাতে মোমগ্রন্থি ও লোম থাকে। কর্ণকুহরের দু'তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি এবং একতৃতীয়াংশ অস্থি দ্বারা তৈরি।

কাজ : ক) এর মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ লম্বভাবে কর্ণপটহে পৌঁছে।

খ) এতে অবস্থিত মোম ও লোম কানের ভেতরে ধুলাবালি প্রবেশে বাধা দেয় এবং জীবাণুনাশ করে।

৩. কর্ণপটহ বা টিম্পেনিক পর্দা : কর্ণকুহরের পথের শেষে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত পাতলা চামড়ার ঝিল্লীকে কর্ণপটহ বলা হয়। এর বাইরের দিক অবতল এবং ভেতরের দিক উত্তল। শব্দ তরঙ্গ কর্ণপটহকে আঘাত করলে

এতে কম্পনের সৃষ্টি হয়। কর্ণকুহরের ত্বকের গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস এ পর্দাকে সর্বদা নরম ও আদ্র রাখে।

কাজ : ক) বহিকর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে পৃথক করে রাখে।

খ) শব্দ তরঙ্গে কেঁপে ওঠে এবং শব্দ তরঙ্গকে সমতলে মধ্যকর্ণে পরিবাহিত করে।

মধ্যকর্ণ : করোটির টিম্পেনিক বুলায় মধ্যকর্ণ অবস্থিত। এটি অসম আকারের বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ট বিশেষ। ইউস্টেশিয়ান নালী দ্বারা এটি গলবিলের সাথে যুক্ত এবং অপরদিকে মাস্টয়ড অস্থির বায়ুগহ্বরের সাথে মিলিত হয়েছে। মধ্যকর্ণে নিম্নলিখিত অংশগুলো বিদ্যমান-

১. ইউস্টেশিয়ান নালী : মধ্যকর্ণের অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত সরুনালী বিশেষ।

কাজ : কর্ণপটহের উভয় পাশের বায়ুচাপ সমান রাখা।

২. কর্ণাস্থি : এগুলো মধ্যকর্ণের গহ্বরে অবস্থিত তিনটি অস্থিসমষ্টি। অস্থি তিনটি হল-

i) ম্যালিয়াস : হাতুড়ির ন্যায় দেখতে এ অস্থি একদিকে কর্ণপটহের সাথে অন্যদিকে ইনকাস-এর সাথে যুক্ত থাকে।

ii) ইনকাস : এটি ম্যালিয়াস ও স্টেপিসের সংযোগকারী অস্থি।

iii) স্টেপিস : ত্রিকোণা এ অস্থিটি একদিকে ইনকাসের সাথে অন্যদিকে ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামে ছিদ্রের গায়ে বসানো থাকে।

কাজ : অস্থিগুলো বহিঃকর্ণের কর্ণপটহ থেকে শব্দ তরঙ্গ অন্তঃকর্ণের পেরিলিম্ফে বহন করে।

৩. ছিদ্রপথ : মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীরের গাত্রে দুটি ছিদ্র আছে। উপরের ডিম্বাকৃতির ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা ওভালিস এবং নিচের গোলাকার ছিদ্রকে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা বলে।

কাজ: ফেনেস্ট্রা ওয়ালিস পেরিলিম্ফে কম্পন সৃষ্টির মাধ্যমে ককলিয়ায় প্রেরণ করে। ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা কম্পনরোধক হিসেবে কাজ করে এবং ককলিয়ায় তরল পদার্থের চলাচল হ্রাস করে।

অন্তঃকর্ণ : অন্তঃকর্ণ করোটির শ্রুতিকোটরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণের প্রধান অংশ মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ। এটি পেরিলিম্ফ নামক তরল পদার্থে পূর্ণ অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ-এ পরিবেষ্টিত। মেমব্রেনাস ল্যারিরিন্থ এন্ডোলিম্ফ নামক তরলে পূর্ণ থাকে। অন্তঃকর্ণ দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; যথা-

১. ইউট্রিকুলাস : এটি অন্তঃকর্ণের উপরের দিকে অবস্থিত গোল প্রকোষ্ঠ। ইউট্রিকুলাসের সাথে তিনটি অর্ধবৃত্তকার নালী সংযুক্ত থাকে। একটি অনুভমিকভাবে ও অন্য দুটি উল্লম্বভাবে অবস্থিত। প্রতিটি নালী ইউট্রিকুলাসে প্রবেশের মুখে স্ফীত থাকে। এ স্ফীত অংশকে অ্যাম্পুলা বলে। এতে সংবেদী রোম থাকে।

কাজ: দেহের ভারসাম্য রক্ষার্থে মস্তিষ্কের সেরেবেলামকে সাহায্য করা।

২. স্যাকুলাস : এটি অন্তঃকর্ণের নিচের দিকের প্রকোষ্ঠ। এটি অঙ্কীয়দেশ থেকে প্রলম্বিত এবং শামুকের খোলকের মত প্যাঁচানো একটি নালীকার সৃষ্টি করেছে। একে ককলিয়া বলে। ককলিয়ার ভেতরের নলকে বলে ককলিয়া নালী। ঐ নালীতে অসংখ্য সরু মোটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারের মত কোষ ও স্নায়ুতন্তু আছে। এদেরকে কর্টির অঙ্গ বলে। তাদের কম্পনের ফলে শ্রবণানুভূতি জন্মে।

কাজ : শ্রবণ অনুভূতি জাগানো।

শ্রবণ প্রক্রিয়া : শব্দ তরঙ্গ কানের ভেতরের অংশে কতকগুলো ধাক্কার আকারে পৌঁছায়। সর্বপ্রথম ধাক্কা লাগে কর্ণপটহে, ফলে তা স্পন্দিত হতে থাকে। এ স্পন্দন ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস-এর মাধ্যমে পেরিলিম্ফে পৌঁছায়। সেখান থেকে শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করে এন্ডোলিম্ফ। এন্ডোলিম্ফ হতে কর্টির অঙ্গ আন্দোলিত হয়। ফলে কোষগুলো বাদ্যযন্ত্রের তারের মত বেজে ওঠে। এ শব্দ তরঙ্গ শ্রবণ স্নায়ুগুচ্ছের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছালে আমরা শুনতে পাই।

কানের রোগ ও প্রতিকার

১. বহিঃকর্ণে অবস্থিত মোমগ্রন্থির কারণে বাহির থেকে প্রবেশকৃত ধুলাবালি জমে থাকে একে খইল বলে। এ ময়লা বা খইল মাঝে মাঝে পরিষ্কার করা প্রয়োজন, না হলে কানে ক্ষতসহ বিভিন্ন ইনফেকশন হতে পারে।

২. কানে আঘাত লাগলে বা অন্য কোনো শক্ত বস্তু দিয়ে কান খোঁচালে কানে ইনফেকশন হতে পারে। এমনকি কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে। কানে পানি জমলে পুঁজ হয়, ইহা কানের অনেক ক্ষতি করে। এজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে কাজ করা উচিত।

৩. অনেকে জন্মগতভাবে বধির হতে পারে। অপারেশনের মাধ্যমে কানে শ্রুতিকোষ স্থাপন করে এ রোগ প্রতিকার সম্ভব।

৪. বাইরে থেকে পিপড়া বা ছোট ছোট পোকামাকড় কানে প্রবেশ করলে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বের করে ফেলা উচিত।

নাক

মাথার সামনে দু'চোখ ও মুখগহ্বরের মধ্যবর্তী স্থানে নাক অবস্থিত। নাক একটি ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়। নাকের ভিতরে এক প্রকার ঝিল্লীর অন্তঃআবরণ থাকে, এ ঝিল্লীকে ঘ্রাণঝিল্লী বলে। ঘ্রাণঝিল্লী অসংখ্য ঘ্রাণ কোষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। ঘ্রাণকোষগুলি অলফ্যাক্টরীস্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত।

কোনো বস্তু থেকে নির্গত গন্ধ নাকের ছিদ্রপথে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ঘ্রাণ কোষগুলোকে প্রথমে উদ্দীপিত করে। এ উদ্দীপনা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়, তখন আমরা ঘ্রাণ অনুভব করি।

নকের রোগ ও প্রতিকার

১. সর্দি কিংবা মস্তিষ্কের কোনো অসুখে ঘ্রাণশক্তি লোপ পায়। তখন আমরা কোনো ঘ্রাণযুক্ত বস্তু থেকে ঘ্রাণ পাই না।

২. মাদকদ্রব্য ব্যবহারে ঘ্রাণশক্তি লোপ পায়।

৩. এছাড়া নাকের ভেতরে ইনফেকশন হতে পারে।

নাকের এসমস্ত রোগে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজন।

জিহ্বা

মুখগহ্বরের ভেতরে অবস্থিত লম্বা, পেশীবহুল অঙ্গটিকে জিহ্বা বলে। মানুষ জিহ্বাকে স্বাদ ইন্দ্রিয় হিসেবে ব্যবহার করে। জিহ্বা ৮-১০ সে.মি. লম্বা হতে পারে। জিহ্বাতে অবস্থিত স্বাদ কোরকের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি। জিহ্বার অগ্রভাগে অবস্থিত স্বাদ কোরকগুলি মিষ্টি, পার্শ্ববর্তী স্বাদকোরকগুলি লবণ ও অম্ল স্বাদ গ্রহণ করে। মধ্যের কোরকগুলিতে কোনো স্বাদ অনুভূত হয় না। এ ছাড়া জিহ্বার পিছনে অবস্থিত বড় স্বাদ কোরকগুলি তিক্ত স্বাদ অনুভব করে।

রোগ ও প্রতিকার

১. ভিটামিন সি জাতীয় খাদ্যের অভাবে মুখগহ্বর ও জিহ্বায় ঘা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় জিহ্বায় লাল বর্ণের দাগ দেখা যায়।
ভিটামিন সি উপস্থিত এমন ফল (যেমন- লেবু) ও সবুজ শাব-সব্জি খেলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

২. ইনফেকশন জনিত কারণে জিহ্বার ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। এ অবস্থায় সবসময় মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

ত্বক

মানবদেহের বহিরাবরণকে ত্বক বলে। ত্বক মানুষের স্পর্শ-অনুভূতি ইন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে। মানবদেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ একক কোষ হল ত্বক। ত্বক তিনটি স্তরে বিভক্ত; যথা- বহিঃস্তর, মধ্যস্তর ও অন্তঃস্তর।

বহিঃস্তর : এটি ত্বকের সর্বাপেক্ষা বাইরের স্তর। এ স্তরটি চ্যাপ্টা আবরণী কোষ দ্বারা গঠিত। এ স্তরে কোনো রক্তজালিকা বা স্নায়ু থাকে না; তবে অসংখ্য লোম থাকে। বহিঃস্তরের কোষগুলো ক্ষয় হয় বা নষ্ট হয় এবং নতুন করে আবার সৃষ্টি হয়। ত্বকের এ স্তরে ঘামাছি, ফোসকা, কড়া ইত্যাদি হয়ে থাকে।

মধ্যস্তর বা ডার্মিস : এটি ত্বকের দ্বিতীয় স্তর তথা বহিঃস্তর ও অন্তঃস্তরের মধ্যবর্তী স্তর। ত্বকের এ স্তরের কোষগুলো জীবন্ত এবং অসংখ্য রক্তজালিকা ও স্নায়ুজালক নিয়ে গঠিত। এ স্তরে বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ বিদ্যমান।

অন্তঃস্তর বা হাইপোডার্মিস : এটি ত্বকের তৃতীয় ও সর্বনিম্ন স্তর। ত্বকের এ স্তরে বিভিন্ন পেশী, ধমনী, শিরা, স্নায়ুজালক ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। গ্রন্থির মধ্যে তৈল গ্রন্থি ও ঘর্মগ্রন্থি উল্লেখযোগ্য। এ স্তরে লোমকূপগুলো অবস্থিত।

কাজ

- ত্বক দেহকে বাইরের আঘাত ও রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- দেহের অপ্রয়োজনীয় জলীয় উপাদান লোমকূপের মাধ্যমে ঘাম আকারে বের হয়ে যায়।
- ত্বকের তৈলগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তৈল পদার্থ ত্বককে মসৃণ ও সতেজ রাখে।
- দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে।
- ত্বক দ্বারা স্পর্শ বেদন, ঠান্ডা, গরম প্রভৃতি অনুভূত হয়।
- সূর্য রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে ভিটামিন ডি তৈরিতে সহায়তা করে।

সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ (যেমন : খোস-পাচড়া, দাদ, একজিমা প্রভৃতি) হতে পারে। ত্বককে সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে এসব চর্মরোগ থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। তবে অধিক হারে সংক্রমিত হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।
- যৌন রোগের কারণে ত্বক সংক্রমিত হতে পারে। এক্ষেত্রে যৌন রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে।
- আর্সেনিক দূষণে চর্মরোগ হতে পারে। এক্ষেত্রে হাতের তালু ও পায়ের তলাতে বেশি সংক্রমণ দেখা দেয়।
- এছাড়া রিং ওয়ার্ম, ডার্মাটাইসিস, কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে।

সারসংক্ষেপ

- কান প্রধানত শ্রবণ ইন্দ্রিয়, তবে দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী হিসেবেও কাজ করে। কান তিন অংশে বিভক্ত; যথা- বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।
- নাক একটি ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়। নাকের ভেতরে অবস্থিত ঘ্রাণঝিল্লির সাহায্যে আমরা ঘ্রাণযুক্ত কোনো বস্তুর গন্ধ পাই।
- জিহ্বা স্বাদ ইন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে। জিহ্বাতে অবস্থিত বিভিন্ন স্বাদ কোরকের সাহায্যে আমরা কোনো জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করি। আমরা বলতে পারি কোনোটা টক, কোনোটা মিষ্টি ও কোনোটা ঝাল ইত্যাদি।
- ত্বক মানুষের স্পর্শ-অনুভূতি ইন্দ্রিয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ত্বক দেহকে বাইরের আঘাত ও রোগ-জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কর্ণপটহ কোথায় অবস্থিত?

ক. কর্ণকুহরে খ. বহিঃকর্ণে গ. মধ্যকর্ণে ঘ. অন্তঃকর্ণে

২. কর্ণের কোন অংশে কটির অঙ্গ উপস্থিত?

ক. কর্ণকুহর খ. কর্ণপটহ গ. ইউট্রিকুলাস ঘ. স্যাকুলাস

৩. নিচের কোনটি ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

ক. নাক খ. জিহ্বা গ. কান ঘ. ত্বক

৪. স্বাদ কোরক নিচের কোনটিতে পাওয়া যায়?

ক. নাক খ. কান গ. জিহ্বা ঘ. ত্বক

৫. লোমকূপ ত্বকের কোনস্তরে থাকে?

ক. বহিঃস্তর খ. মধ্যস্তর গ. ডার্মিসে ঘ. অন্তঃস্তর বা হাইপোডার্মিসে

৬. কুষ্ঠ রোগ কোথায় হয়?

ক. চোখ খ. কান গ. ত্বক ঘ. নাক।

পাঠ ১৯.৬

প্রজননতন্ত্র

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রজননতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- পুং প্রজননতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন। এর কাজ উল্লেখ করতে পারবেন;
- স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন। এর কাজ লিখতে পারবেন;
- নিষেক সম্বন্ধে ধারণা দিতে পারবেন;
- প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগ উল্লেখ করতে পারবেন;
- রোগগুলোর প্রতিকার ব্যবস্থা নিরূপণ করতে পারবেন।

প্রজননতন্ত্র

প্রজনন একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ সত্ত্বা ও আকৃতি বিশিষ্ট অপত্য জীব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে তাকে প্রজনন বলে। মানুষে উন্নত ধরনের যৌন প্রজনন সম্পন্ন হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী গ্যামেটের সৃষ্টি হয় এবং গ্যামেটদ্বয়ের মিলনে সৃষ্ট জাইগোট থেকে পর্যায়ক্রমে মানব শিশু বিকাশ লাভ করে।

প্রজননের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহকে প্রজনন অঙ্গ বলে। আর প্রজনন অঙ্গসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয় প্রজননতন্ত্র। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণি। অর্থাৎ এদের জননাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান করে। নিচে মানুষের পুং ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হল-

পুং প্রজননতন্ত্র

মানুষের পুং প্রজননতন্ত্র নিচের অংশগুলো নিয়ে গঠিত। যথা- শুক্রাশয়, এপিডিডাইমিস, ভাস ডিফারেন্স, সেমিনাল থলিকা, ক্ষেপন নালী, বহিঃযৌনাঙ্গ ইত্যাদি।

শুক্রাশয় : পুং প্রজননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গের নাম শুক্রাশয়। পুরুষ মানুষের দেহে একজোড়া শুক্রাশয় থাকে। উদরের নিম্ন প্রান্তে বাহিরে একজোড়া অন্ডথলি বা স্ক্রোটাম থলিতে শুক্রাশয় দুটি অবস্থিত। প্রতিটি শুক্রাশয়ে অসংখ্য সেমিনিফেরাস নালিকা থাকে এবং নালিকাগুলোর অন্তবর্তী স্থানে গুচ্ছাকারে ইন্টারস্টিসিয়াল কোষ থাকে। এদের অগ্রভাগ প্যাঁচানো এবং পশ্চাৎভাগ সোজা।

কাজ : ক. সেমিনিফেরাস নালিকা স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন করে।

খ. ইন্টারস্টিসিয়াল কোষ টেস্টোস্টেরণ হরমোন উৎপন্ন করে।

এপিডিডাইমিস : এটি অত্যন্ত কুন্ডলীকাকার নালীকা। এপিডিডাইমিস শুক্রাশয়ের শীর্ষদেশে এবং পশ্চাতে কুন্ডলীকৃত হয়ে টুপির মত অবস্থায় অবস্থান করে। এপিডিডাইমিস উপর থেকে নিচে মাথা, দেহ ও লেজ-এ তিন প্রধান অংশে বিভক্ত। এ এপিডিডাইমিসের প্রশস্ত মাথাটি শুক্রাশয়ের সাথে ইফারেন্ট নালিকার মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। এর লেজটি সরু, এটি শুক্রনালী বা ভাস ডিফারেন্সে উন্মুক্ত হয়। শুক্রাশয় থেকে এপিডিডাইমিসে শুক্রাণু বহনকারী নালীকে ভাস ইফারেন্স বলে।

কাজ : ক. বিভিন্ন নালিকা ঘুরে এপিডিডাইমিসে আসে।

খ. প্রতিটি এপিডিডাইমিসে শুক্রাণু প্রায় একমাস অবস্থান করতে পারে।

গ. পুষ্টি পদার্থ ক্ষরণ করে শুক্রাণুদের সতেজ করে।

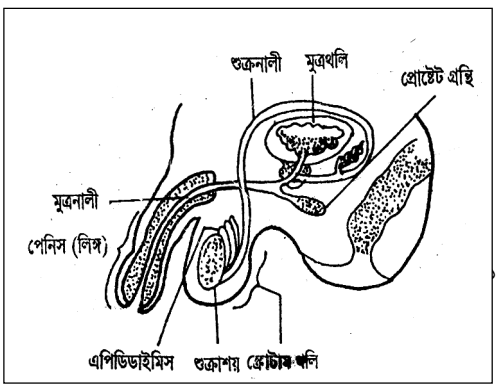

ভাস ডিফারেন্স : প্রতিটি এপিডিডাইমিসের লেজ থেকে একটি করে মোটা নালী উৎপন্ন হয়। একে ভাস ডিফারেন্স বা শুক্রনালী বলে। প্রতিটি ভাস ডিফারেন্স প্রায় ৪০-৫০ সে.মি. লম্বা। ভাস ডিফারেন্স প্রোস্টেট গ্রন্থিতে প্রবেশ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্ফীত হয়। এ স্ফীত অংশকে অ্যামপুলা (ampulla) বলে।

কাজ : ক. শুক্রাণু সঞ্চিত রাখে (অল্প সময়ের জন্য)।

চিত্র ১৯.৬-১ : পুং প্রজননতন্ত্র

খ. শুক্রাণু পুষ্টি সরবরাহ করে।

গ. সঙ্গমের সময় দ্রুত শুক্রাণু পরিবহন করে।

সেমিনাল থলিকা : ভাস ডিফারেন্সদ্বয় যেখানে প্রোস্টেট গ্রন্থিতে প্রবেশ করে, সেখানে স্ফীত থলিকাকার গ্রন্থি সদৃশ নালীদ্বয়কে সেমিনাল থলিকা বলে। অর্থাৎ ভাস ডিফারেন্সের গোড়ায় মূত্রথলি এবং মলাশয় এর মাঝখানে অবস্থিত থলিকাকার কুঞ্চিত নালীদ্বয়কে সেমিনাল থলিকা বলে। কুঞ্চিত অবস্থায় এটি ৫ সে.মি লম্বা এবং অকুঞ্চিত অবস্থায় ১০-১৫ সে.মি লম্বা।

কাজ : সিমেন (সেমিনাল রস) নামক এক প্রকার পিচ্ছিল তৈরি করাই এদের কাজ। সেমিনাল রস প্রধানত শুক্রাণুদের পুষ্টি যোগায় এবং শুক্রাণুদের ধারণ করে।

ক্ষেপন নালী : প্রতিটি সেমিনাল থলিকা থেকে সৃষ্ট একটি করে খাটো নালী, প্রতিটি ভাস ডিফারেন্সের অ্যাম্পুলার সাথে একীভূত হয়ে ১৯ মি.মি লম্বা ও ০.৩ মি.মি ব্যাসের একটি অভিন্ন নালী তৈরি করে। এ নালীকে ক্ষেপন নালী বলে।

কাজ : সেমিনাল রসসহ শুক্রাণুকে সেমিনাল থলিকা ও ভাস ডিফারেন্স থেকে রেচন-জনন নালীতে প্রেরণ করে।

বহিঃযৌনাঙ্গ : এটি দুধরনের; যথা-

ক. অন্ডথলি বা স্ক্রোটাম : এটি দুই উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকা ও ত্বকে আবৃত থলি বিশেষ। অন্ডথলি দুটি। প্রতিটি অংশ শুক্রাশয়, এপিডিডাইমিস ও শুক্রাণুর কিছু অংশ ধারণ করে।

কাজ : ক. শুক্রাণু উৎপাদনের অনুকূলে তাপমাত্রা রক্ষা করে।

খ. শুক্রাশয়কে চাপজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

খ. শিশ্ন বা পুরুষাঙ্গ : শিশ্ন হচ্ছে পুরুষের এমন একটি বহিরাঙ্গ যার ভেতর দিয়ে রেচন-জনন নালী বাইরে উন্মুক্ত হয়। এর ত্বকের নিচে চর্বি নেই কিন্তু পাতলা টিস্যু আছে। এজন্য শিশ্নের ত্বক এত আলগা। যে অংশ থেকে শিশ্ন উঠে এসেছে তাকে শিশ্নমূল বা লিঙ্গমূল বলে। শিশ্নের যে অংশ ঝুলে থাকে তাকে শিশ্নদেহ বা লিঙ্গদেহ বলে। শিশ্নদেহের ডগার লাল মুন্ডকে গ্লানস পেনিস (glans penis) বলে। এতে সবচেয়ে বেশি স্নায়ুরপ্রান্ত উন্মুক্ত থাকে।

কাজ : প্রজনন ক্রিয়ার সময় দৃঢ় ও প্রসারিত হয়ে মূত্রনালীর মাধ্যমে বীর্য (শুক্রাণু) স্ত্রী জননাঙ্গের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্র

মানুষের স্ত্রী প্রজননতন্ত্র নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত; যথা- ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী, জরায়ু, যোনি, ভালভা।

ডিম্বাশয় : স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের প্রধান অঙ্গের নাম ডিম্বাশয়। এদের সংখ্যা একজোড়া। প্রতিটি ডিম্বাশয় কাঠবাদাম আকৃতির, ৩-৫ সে.মি লম্বা, ২-৩ সে.মি প্রস্ত ও ওজন প্রায় ৪ গ্রাম। শ্রোণীর পিছনের ফাঁপা গহ্বরে জরায়ুর দু'পাশে ইউরেটরের নিচে একজোড়া ডিম্বাশয় জরায়ু এবং ফেলোপিয়ান নালীসহ উদরে একটি পেরিটোনিয়াম পর্দার ভাঁজ করা টিস্যুর সাহায্যে আটকে থাকে।

কাজ : ক. ডিম্বাণু উৎপন্ন করা।

খ. স্ত্রী যৌন হরমোন-ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরণ ক্ষরণ করা।

গ. এদের প্রভাবে ঋতুচক্র, গর্ভ, অমরা, জননেন্দ্রিয়, মাতৃস্তন পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

ডিম্বনালী : এরা প্রায় ১২ সে.মি দীর্ঘ নালী এবং জরায়ুর দু'পাশে অবস্থান করে। এদের একপ্রান্ত ডিম্বাশয়ের কাছে পেরিটোনাল গহ্বরে এবং অন্যপ্রান্ত জরায়ুর গহ্বরে উন্মুক্ত। ডিম্বাশয় সংলগ্ন প্রান্তটি অসংখ্য আঙ্গুলের মত

প্রবর্ধনযুক্ত হয়ে ঝালর বা ফিমব্রিতে পরিণত হয়।
কাজ : ক. ডিম্বাশয় থেকে পতিত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করে জরায়ুর দিকে ধাবিত করে এবং শেষে জরায়ুতে পৌঁছে দেয়।
খ. রস ক্ষরণ করে শুক্রাণুকে উর্ধ্বপ্রান্তে উঠে এসে ডিম্বাণুকে নিষিক্তকরণে সহায়তা করে।
জরায়ু : জরায়ু পেলভিস অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং মোটা প্রাচীরযুক্ত একটি পেশীবহুল ফাঁপা অঙ্গ। এটি লম্বায় প্রায় ৭.৫ সে.মি, প্রস্থে প্রায় ৫.০ সে.মি এবং আকৃতি অনেকটা উল্টানো নাশপতির ন্যায়। জরায়ু তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা- উপরের অংশ ফান্ডাস, মধ্যখানে জরায়ু দেহ এবং নিচে নলাকৃতি সারভিক্স। সারভিক্সের সরুপথে যোনির সাথে জরায়ু সংযুক্ত থাকে। মসৃণ পেশী দ্বারা গঠিত জরায়ু প্রাচীরের বাইরের স্তরকে মায়োমেট্রিয়াম এবং গ্রন্থি ও রক্তজালক সমৃদ্ধ ভেতরের স্তরকে এন্ডোমেট্রিয়াম বলে।
কাজ : ক. জরায়ুতে ভ্রূণের বিকাশ ঘটে।
খ. প্লাসেন্টা তৈরিতে সহায়তা করে।
যোনি : জরায়ু থেকে ভালভা পর্যন্ত পেশী দ্বারা তৈরি নালীকে যোনি বলে। এটি প্রায় ৮-১০ সে.মি লম্বা এবং এর প্রাচীর ভাঁজযুক্ত। এ ভাঁজগুলোকে রুগী (rugae) বলে। কুমারীদের যোনিপথে সতীচ্ছেদ বা হাইমেন (hymen) নামে একটি যোনিপথ অবরোধকারী পর্দা দেখা যায়।
কাজ : ক. মাংসল প্রাচীরের সাহায্যে যে কোনো আকারের শিশ্নকে গ্রহণ করা।
খ. বীর্য স্খলনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনা প্রদান করা।
গ. বীর্য গ্রহণ করা।
ঘ. শিশু জন্মদানকালে প্রসারিত হয়ে শিশু প্রসবে সহায়তা করা।
ঙ. পিচ্ছিল মিউকাস পদার্থ নিঃসরণ করা।
ভালভা : যোনিমুখের কতকগুলো অঙ্গকে একত্রে ভালভা বলা হয়। এদের মধ্যে লেবিয়া মেজরা, লেবিয়া মাইনরা, ক্লাইটরিস, ভেস্টিবিউল এবং ভেস্টিবুলার গ্রন্থি প্রধান।
কাজ : ভালভা যোনিমুখকে ঢেকে রাখে।

নিষেক

পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের মিলনকে নিষেক বলে। ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বপাতের পর ডিম্বাণু ডিম্বনালীতে প্রবেশ করে ৬-৭ ঘণ্টা অবস্থান করে। এ সময়ই নিষেক ঘটে। অন্যদিকে, শুক্রাণুগুলোর নিষিক্ত করার ক্ষমতা থাকে ৪৯ ঘণ্টা।

স্খলিত শুক্রাণু ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার জন্য লেজের সাহায্যে সাঁতার কেটে ডিম্বনালীর তরল বেয়ে বেশ উপরে, প্রায় মুক্ত প্রান্তের কাছাকাছি চলে যায়। একটি ডিম্বাণু নিষেকের জন্য একটি মাত্র সুস্থ শুক্রাণু প্রয়োজন। কিন্তু নিষেক নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একসাথে কয়েক মিলিয়ন শুক্রাণু ডিম্বাণুর দিকে ধাবিত হয়। ডিম্বাণু নিঃসৃত ফ্যার্টিলাইজিন এবং শুক্রাণু নিঃসৃত অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন নামক রাসায়নিক পদার্থের আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে শুক্রাণুগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ডিম্বাণুর চারপাশে এসে ভিড় করে এবং এর বাইরের করোণা রেডিয়াটা আবরণকে ঠোকরাতে থাকে।

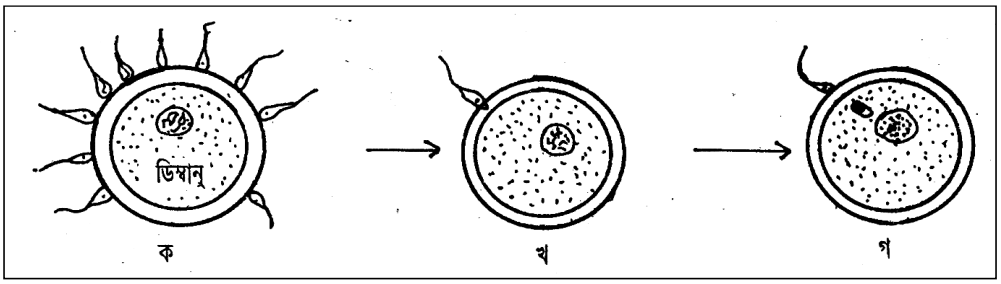

চিত্র ১৯.৬-২ : নিষেকের ধাপসমূহ : (ক) একটি ডিম্বানুকে ঘিরে অনেকগুলো শুক্রানু, (খ) একটি মাত্র শুক্রানু ডিম্বানুর আবরণ ভেদ করতে পেরেছে এবং (গ) শুক্রানুর মস্তক অংশটি খুলে গিয়ে ডিম্বানুর নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়েছে।

ডিম্বাণুকে স্পর্শ করা মাত্র শুক্রাণু দেহ থেকে হায়ালুরোনিডেজ এনজাইম ক্ষরিত হয়ে করোনা রেডিয়াটার কোষগুলোর আন্তঃসংযোগ ভাঙ্গার চেষ্টা করে একসময় সফল হলেও নিচের জোনা পেলুসিডা আবরণ বিগলনের জন্য শুক্রাণু মস্তকের অ্যাক্রোসোমাল টুপি থেকে স্পার্ম লাইসিন এনজাইম নিঃসরণের প্রয়োজন হয়।

স্পার্ম লাইসিনের প্রভাবে জোনা পেলুসিডার খানিকটা অংশ বিগলিত হলে একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর ভেতরে প্রবেশ করে। তখন সাথে সাথেই জোনা পেলুসিডা আবার আগের মতো দুর্ভেদ্য হয়ে যায়, ফলে অন্য কোনো শুক্রাণু প্রবেশ করতে পারে না।

এ সময় ডিম্বাণুতে মিয়োসিস বিভাজন ঘটে এবং ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসটি স্ত্রী-প্রোনিউক্লিয়াসে পরিণত হয়ে ডিম্বাণুর কেন্দ্রে চলে আসে। ইতোমধ্যে প্রান্ত থেকে শুক্রাণু নিউক্লিয়াসও ডিম্বাণু কেন্দ্রে এসে ডিম্বাণুর প্রো-নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয় এবং জাইগোট গঠন করে। জাইগোট সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিষেক প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে।

জাইগোট গঠনের পর সেটি মাতৃদেহের জরায়ুতে অবস্থান নেয়। জরায়ুতে ভ্রূণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট সময় পর সন্তান ভূমিষ্ট হয়।

সাধারণ রোগ ও প্রতিকার

সিফিলিস : এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত যৌনঘটিত রোগ। *Treponema pallidum* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। অপরিচ্ছন্ন যৌন সংস্পর্শে এ রোগ হয়। বিশেষ করে মাদকাসক্ত যৌনকর্মীদের মাধ্যমে এ রোগ বেশি ছড়ায়। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ সম্ভব।

গনোরিয়া : এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। *Neisseria gonorrhoeae* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়। এটিও একটি যৌন সংক্রামক রোগ। অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিচ্ছন্ন যৌন সঙ্গমের ফলে এ রোগ ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করে।

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করে এ রোগ থেকে প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে।

এইডস (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) **:** এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ। HIV (Human Immuno Deficiency Virus) দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীতে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রোগ এটি। অনিয়ন্ত্রিত যৌন সঙ্গম বিশেষ করে হোমো সেক্সুয়ালিটির জন্য এ রোগ বেশি হয়। এছাড়া ইনজেকশন সূঁচ (ব্যবহৃত), HIV যুক্ত রক্ত গ্রহণ ইত্যাদি কারণেও এ রোগ ছড়ায়।

এইডস-এর কোনো চিকিৎসা নেই। এজন্য এইডস-এর কারণগুলি চিহ্নিত করে তা প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

[এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে জনসংখ্যা ও পরিবেশ ইউনিটে]

সারসংক্ষেপ

- প্রজননের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গসমূহকে প্রজনন অঙ্গ বলে। আর প্রজনন অঙ্গসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয় প্রজননতন্ত্র।
- মানুষের পুং প্রজননতন্ত্র শুক্রাশয়, এপিডিডাইমাস, ভাস ডিফারেন্স, সেমিনাল থলিকা, ক্ষেপন নালী, বহিঃযৌনাঙ্গ ইত্যাদি যৌনাঙ্গ-এর সমন্বয়ে গঠিত।
- মানুষের স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী, জরায়ু, যোনি, ভালভা ইত্যাদি অঙ্গ নিয়ে গঠিত।
- পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর একীভূত হওয়াকে নিষেক বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পুং প্রজননতন্ত্রের প্রধান অঙ্গের নাম কি?
ক. এপিডিডাইমিস খ. শুক্রাশয় গ. ভাস ডিফারেন্স ঘ. সেমিনাল থলিকা

২. পুং প্রজননতন্ত্রে কয়টি শুক্রাশয় থাকে?
ক. একজোড়া খ. দু'জোড়া গ. তিনজোড়া ঘ. চার জোড়া

৩. ডিম্বাণু উৎপন্ন হয় কোথায়?
ক. ডিম্বনালী খ. জরায়ু গ. ভালভা ঘ. ডিম্বাশয়।

৪. স্ত্রী যৌন হরমোনের নাম কি?
ক. টেস্টোস্টেরণ খ. থাইরক্সিন গ. ইস্ট্রোজেন ঘ. থাইমোসিন

৫. পুং যৌন হরমোনের নাম কি?
ক. টেস্টোস্টেরণ খ. ইস্ট্রোজেন গ. প্রোজেস্টেরণ ঘ. গ্লুকাগণ

৬. শুক্রাণুর কত ঘণ্টা নিষিক্ত করার ক্ষমতা থাকে?
ক. ৩৯ ঘণ্টা খ. ৩৫ ঘণ্টা গ. ৪৯ ঘণ্টা ঘ. ৫৯ ঘণ্টা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১. শ্বসন কাকে বলে? শ্বসনতন্ত্রের গঠনপ্রণালী বর্ণনা করুন।
২. শ্বসন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।
৩. রেচনের সংজ্ঞা লিখুন। রেচনতন্ত্রের গঠন ব্যাখ্যা করুন।
৪. রেচনতন্ত্রের কাজগুলো উল্লেখ করুন।
৫. স্নায়ুতন্ত্রের সংজ্ঞা দিন। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন বর্ননা করুন।
৬. স্নায়ুকোষের গঠন উল্লেখ করুন। এর কাজ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৭. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির সংজ্ঞা লিখুন। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর নাম লিখুন।
৮. চিত্রসহ চোখের গঠন বর্ণনা করুন।
৯. চোখের কাজগুলো লিখুন।
১০. কানের গঠন বর্ণনা করুন। কানের কাজ লিখুন।
১১. ত্বকের গঠন উল্লেখ করুন। ত্বকের কাজ কি?
১২. পুং প্রজননতন্ত্রের গঠন বর্ণনা করুন।
১৩. স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের বর্ণনা দিন।
১৪. নিষেক কাকে বলে, চিত্রসহ লিখুন।
১৫. টীকা লিখুন: (ক) নাক (খ) জিহ্বা (গ) প্রজননতন্ত্র
(ঘ) শ্বসনতন্ত্র (ঙ) রেচনতন্ত্রের রোগ (চ) স্নায়ুতন্ত্র (ছ) চোখের রোগ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :	১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ঘ	৫. ক	৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :	১. গ	২. খ	৩. ক	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. খ	৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :	১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. গ	৫. ঘ	৬. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. ক	৬. গ।